।। সাহিত্যের আলোকে সিনেমাটোগ্রাফি ।।

'আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে ।' /বোধ

'এই সৃষ্টি রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।' কা(বাসনা/জীবনানন্দ দাস ।

'দেবঋষি যোগে বসেছিলেন ।নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল ।অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা । নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না । এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু আরো একটু । সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক সেদিক এধার ওধার সে ধার । ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো ! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো ! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি ! ('চরাচর জুড়ে এক অদ্ভুত আলো দেখেছিলাম পূর্ণসূর্যগ্রহণের সময় ! আহা, কেমন মৃদু ঠাণ্ডা আস্তরণ যেন !') আকাশ জুড়ে কে যেন সাত রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোন দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি—একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে! —(ইস্টম্যান কোডাক 'গ্রে-স্কেল' কি ?)

কপিলাবস্তুর রাজবাড়ি । রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন । ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ । আরো ওধারে অনেক দূরে হিমালয় পর্বত সাদা বরফে ঢাকা । আর সেই পাহাড়ের ওপারে আকাশ-জুড়ে আশ্চর্য এক সাদা আলো (তার মাঝেসিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছে । রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম ! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না ! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল ।' নালক / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

স্বেন নিকভিস্ট, যিনি একশোটারও বেশী কাহিনীচিত্রের সিনেমাটোগ্রাফার, যাঁর আলোকচিত্রায়ণে সত্তর সংরক্ত(রূপ উদ্ভাসিত। যিনি ইঙ্গমার বার্গম্যান পরিচালিত 'ত্র(াই অ্যান্ড হুইসপারস' এবং 'ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজেন্ডার' ছবির আলোকচিত্রায়ণের জন্য দু-দু'বার 'অস্কার' বিজয়ী ।নিকভিস্ট বলেছেন—'আমি ইঙ্গমার ব্যার্গম্যানের সঙ্গে কুড়িটা ছবিতে কাজ করতে করতে অনেক রকম আলোর ভাষা আবিষ্কার করেছি । আলো সম্ভ্রান্ত, স্বপ্নবৎ, নিঃস্ব, জীবন্ত, মৃত, পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় , তির্যক, যৌনস্পর্শী, আবছা, বিষাক্ত(, রহস্যময়, উত্তপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, হিংস্র, প্রেমময়, পতনশীল, প্রশান্ত এবং বিবর্ণ ।'

একটু মনোযোগ দিয়ে সাহিত্য পাঠ করলে আমরাও নিকভিস্টের মত সাহিত্যের বিশাল আকাশে অনেক রকম আলোর ভাষা আবিষ্কার করতে পারবো । সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রে আলোর ভাষার ব্যবহার মূলত একই । কিন্তু চলচ্চিত্রে আলো

অনেক সীমাবদ্ধ পরিসরে ব্যবহৃত হয়, মূলত লেন্স, ফিল্ম এবং ফোটো-রসায়নের সীমাবদ্ধতার জন্য । সাহিত্যের আলো যেখানে অনেক বেশী বিমূর্ত এবং অপার কল্পনা নির্ভর, চলচ্চিত্রের আলো সেখানে একেবারেই বাস্তবধর্মী এবং দৃশ্যনির্ভর। সাহিত্যে যেখানে অন্ধকার কল্পনা করা হয়েছে, সিনেমাটোগ্রাফিতে সেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'আলোর অস্তিত্ব' আছে । যেহেতু আলো ছাড়া কোন কিছুই আমরা দেখতে পারি না । সাহিত্যের উপাদান কাগজ, কালি, কলম কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত একাধিক বৈজ্ঞানিক বিষয় ।

নিকভিস্টের মতে,—'কোনও চলচ্চিত্রের জন্য আপনি কেমন করে সঠিক আলো নির্বাচন করবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর লিখিত ভাবে দেওয়া অসম্ভব । এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব সিদ্ধান্ত । শিল্পীর নিজস্ব আর্তি । এটা সবাইকে বলার কথা নয় । এটা নির্ভর করে ফোটো-রসায়ন এবং একটা ভাল চিত্রনাট্য ও ভাল সংগঠনের উপর । যেখানে সবাই একই পরিবার ভুক্ত(।

আমি কী করছি, কেন করছি, সব সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বলি, বলি যে সত্য নিহিত আছে আপনাদের চরিত্রে, চোখে, সত্তায় । আপনি যদি ওদের দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারেন, আপনি ওদের সত্তা স্পর্শ করতে পারবেন । যদি ফোটো-রসায়ন আপনার কাজে বিঘ্ন না ঘটায়, আপনি আপনার ছবির মর্মসৌন্দর্য ফোটাতে পারবেন আপনার সৃষ্টিতে । আর সেটাই হবে আশ্চর্য ম্যাজিকের বিস্ময় ।'

বেশ কিছু সাহিত্যাংশ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের আলোর ভাষার ব্যবহারের মিল-অমিলের রহস্যময়তা, দ্বন্দ্ব ।

'জেনের থেকেও খাবিশজেন আরও...বলতে বলতে সাকিনা বেওয়ার মুখখানা হারিকেনের আলোর আবছা অন্ধকারে ভৌতিক মাত্রা পেয়ে নড়তে থাকে । আমরা চার ভাই গায়ে গা লাগিয়ে । ছোট বোন বাহেলা তখন দোলনায় দোলে । দড়ির দোলা টালির চালের বাতা থেকে শূন্যে ঝোলে । এ দোলাও বুনেছে আমার দাদি, সাকিনা বেওয়া, অন্ধকারে বাহেলা কেঁদে ওঠে। দোলার আশে পাশে দু-একটি জোনাকির ফুল । হারিকেনের চিমনির কাচে কালি পড়ে মাটির দেয়ালে দাদির ছায়া অনেকটা লম্বা। তা কখনও নড়ে, কখনও স্থির...

'পথের পাঁচালী' ছবিতে অপু-দুর্গাকে ইন্দির ঠাক(ণের ভূতের গল্প বলার দৃশ্যে দেওয়ালে ইন্দির ঠাক(ণের ছায়ার কথা মনে পড়ছে না ?

আইজেনস্টাইন-এর 'ইভান দা টেরিবল' ছবিতে ইভানের ছায়ার ব্যবহার তো চিরস্মরণীয় ।

ছায়ার ব্যবহারের আর একটা স্মরণীয় ছবি কুরোসাওয়ার 'রেড বেয়ার্ড' । মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্তে বৃদ্ধ তার পাপ স্বীকার করে দু'হাত তুলে ঈ(রের কাছে প্রার্থনা করছে । দেওয়ালে বৃদ্ধের কম্পিত হাতের ছায়া আমাদের আর্তিকে স্পর্শ করে ।)

'রোজার বয়েস তেমন নয় । মাঝবয়সী, হালকা কাঁচা পাকা দাড়ি আছে মুখে । লম্বা পাতলা ফরসাও । বলতে বলতে সাকিনা বেওয়া তার নাতিদের মুখ একবার করে দেখে নেয় । আধো আঁধারে লণ্ঠনের আলোয়, তারা সব চুপ । আর এখন পার্কসার্কাসের এই বহুতলে লোডশেডিং-এর গাঢ় অন্ধকারে মিনি জেনারেটর জেগে ওঠা স্কোয়ার ফিট মাপা খোপে খোপে যেটুকু আলো—কোনো কোনো চৌকো খুপরি—বাইরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলে এ রকমই মনে হয়—যখন বিদ্যুৎহীন অন্ধকার থাকে, তখন একটা আস্ত দাবার ছক হয়ে যায় এই মালটিস্টোরিড—'আরাধনা অ্যাপার্টমেন্ট' ।

'বিদেশী কিংসাইজের মুখে দীর্ঘ ছাই জমেছিল । ফ্ল্যাটের বাতাসে ধোঁয়ার দূষণ । এখনও কোন ফোন এলো না । শোবার ঘরে কাঁচ ঢাকা নিচু টেবিলে নির্বাক সাদা প্রিয়দর্শনী । দেয়ালে প্রকাশ কর্মকারের নারী ও ঘোড়া হয়ত বা জেনারেটরের ম্লান আলোয় খানিকটা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে—রাহান তো ঘরে বড় করে আলো জ্বালেনি । টেবিল ল্যাম্পের বাহারি কাপড়ের শেডের বাইরে যেটুকু আলো, তাতে আরও আঁধার ঘনায় । ঘরের সবটুকু কালোর ভেতর সেই আলোক—আঁধারটিকে কোন পদ্মের সঙ্গে তুলনা করলে যদিও পদ্ম এখন নির্বাচনী প্রতীক ও বাবরি ধ্বংসের গে(য়া তাণ্ডবে রাহান আলি শুধু এই নামটুকুর ে(ত্রে বিপদ চিহ্(হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটুকু কবিত্ব করা যায় তাও পারে না ।

এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার—কিন্নর রায়

চলচ্চিত্রে আলোর অসাধারণ ব্যবহার আছে অ্যালফ্যাসিনো অভিনীত 'সেন্ট অফ দা উইমেন' ছবিতে । যে দৃশ্যে , প্রথম

অ্যালফ্যাসিনোকে দেখানো হয়—ফাঁকা প্রায় অন্ধকার ঘরে একাকী একটা চেয়ারে বসে মদ খাচ্ছে, ডানদিকের জানালা দিয়ে একফালি তীব্র তির্যক আলো ওর হাত এবং চেয়ারের হাতলের উপরে রাখা মদের গ্লাসের উপর পড়েছে, মুখ প্রায় দেখা যাচ্ছে না । উল্লেখযোগ্য, অ্যালফ্যাসিনো একজন অন্ধ আর্মি অফিসার ।

আর একটা দৃশ্যে, অ্যালফ্যাসিনো আলোতে এবং স্কুল পালানো ছেলেটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে । অ্যালফ্যাসিনো কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে বলছেন, তিনি নিজেকে শেষ করে দেবেন । স্কুলের ছেলেটা শান্ত ভাবে বলে—'এত সুন্দর জীবন আপনি শেষ করে দেবেন ?' অ্যালফ্যাসিনো উত্তেজিত ভাবে উত্তর দেন—'তুমি বলছো জীবন, জীবন—কোথায় জীবন? আমি তো অন্ধকারে।' আলোর এই রকম শৈল্পিক প্রয়োগ আছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'ইনার আই' তথ্যচিত্রে । অন্ধ চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়কে প্রথমে উপস্থাপন করা হয় শূন্য ঘরের মধ্যে, চেয়ারে বসে আছেন । মেঝেতে একটা স(আলোর রেখা ফ্রেমকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে । তপন সিংহের 'অন্তর্ধান' ছবিতে রাত হয়ে যাচ্ছে, মেয়ে বাড়ী ফিরছে না, চিন্তিত অস্থির বন্দী বাবা বারান্দার গ্রিলের ভিতর দিয়ে আসা আলো-ছায়ার জালের মধ্যে চুপচাপ বসে অপে(া করছে । শেখর বসু 'রহস্যের পাঁচ ঠিকানা' গল্পে লিখেছেন—'মাথার উপর ফুল ভর্তি গাছের ডাল । ফুটপাতে জাফরি-কাটা ছায়া, গোয়েন্দার মাথার মধ্যেও আলো, ছায়ার নকশা দুলছে । টের পাচ্ছিল পুরো ব্যাপারটাই বিচ্ছিরিভাবে পাকিয়ে গেছে ।'

ইস্তান জাবোর 'মেফিস্টো' ছবিতে আলোর অসাধারণ ব্যবহার আছে শেষ দৃশ্যে । যেখানে অভিনেতা স্টেজে আলোর বৃত্তের বাইরে যেতে পারছে না । যেখানে আলো রাজনৈতিক (মতার প্রতীক । একজন অভিনেতা, যতই (মতাবান হোন না কেন, তিনি তো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অতিত্র(ম করতে পারেন না । সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে বিমলা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে মোহমুগ্ধ ভাবে সন্দীপের বক্তৃ(তা শুনছে, দোতলা থেকে । জাফরির ফাঁক দিয়ে আসা কাটা কাটা আলোতে বসে । 'তিনকন্যা' ছবিতে 'মণিহারা' অংশে মণির কাছে যখন স্বামী কালী ব্যানার্জী গহনাগুলি চায় বন্ধক দেবার জন্য, সেই সময় মণি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, জানালার পর্দা হাওয়াতে দুলে ওঠে । মণির মুখে আলো-ছায়া কাঁপে । স্বাভাবিক আলো-ছায়ার অসাধারণ নাটকীয় ব্যবহার আছে কুরোসাওয়ার 'রশোমন' ছবির জঙ্গলের দৃশ্যগুলিতে । অপর্ণা সেন-এর 'যুগান্ত' ছবিতেও কয়েকটা দৃশ্যে চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিন্তা-ভাবনা প্রকাশে কম্পিত আলো-ছায়ার সুন্দর প্রয়োগ আছে । আলোর ভাষার চমৎকার প্রয়োগ আছে, ক্যারোলিন লিঙ্ক পরিচালিত জার্মানী 'বিয়ণ্ড সাইলেন্স' ছবিতে । আঠারো বছরের লারাকে ওর পিসেমশাই খবর দেয় যে, ওর মা'র অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে । মা আর পৃথিবীতে নেই । এর পর আমরা দেখি, দেওয়ালে জানালার পর্দার আলো-ছায়া নড়ছে । ক্যামেরা নেমে আসে বিছানার ওপর । বিছানায় লারা, বাবা, ছোটবোন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে । ওদের ওপর জানালার পর্দার আলো-ছায়ার ঝড় বইছে । সারা ঘরে কাঁপছে একটা নিঃঝুমতা ।

সিনেমাটোগ্রাফির সুন্দর ব্যবহার করেছেন হংকং-এর পরিচালক ইম হো তাঁর 'দ্যা ডে দ্য সান টার্নড কোল্ড' ছবিতে । অদ্ভুত নীলচে ঠান্ডা আলো মা'র যন্ত্রণা প্রকাশ করার জন্য এবং উল্টোদিকে ঝকঝকে আলোয় আমরা দেখি অন্যসব চরিত্রকে। লাইট স্কীমের যথার্থ শৈল্পিক ব্যবহার ।

প্রকৃতির আলোর যথার্থ ব্যবহার আছে গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবিতে । স্বপ্নালু জ্যোৎস্নাতে বন্দী প্রেমিককে প্রেমিকা খাওয়াচ্ছে । 'পার' ছবিতে পড়ন্ত সূর্যের আলোতে পাহাড়ে জমিদারের ভাইকে গ্রামবাসীরা মারছে । নাসিরউদ্দিন ফিরে এসে চাঁদের আলোতে কুয়ো থেকে জল তুলে শরীরে ঢালছে । 'দখল' ছবিতে নিজের জমিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কা নিয়ে আন্ধি, মমতা শংকর চরাচর ভেসে যাওয়া জ্যোৎস্না রাতে নিজের বাগানের সব্জি দেখছে স্বপ্নের মত ।

সাহিত্যের বিশাল আকাশে খুঁজলে আলোর ভাষার অনেক রকম ব্যবহার-এর সন্ধান পাওয়া যাবে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাম 'প্রথম আলো' আবার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাম 'আলো নেই'। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে গলে মশারির মধ্যে আমাদের সঙ্গে শুতে এসেছিল' । আশাপূর্ণা

দেবী লিখেছেন 'এক ফালি রোদ যেন, ভোজালির মত এসে বাঁকা হয়ে বিঁধতে লাগলো ।' বাণী বসু 'মৈত্রেয় জাতক'-এ লিখেছেন 'এখন যামভেরীর শব্দে ঘুম ভেঙে মনে হল সমস্ত ঘরটা যেন হা-হা করছে। প্রশস্ত শয্যার অপর প্রান্তে তো রাজা নেই । মৃদু দীপ মৃদুতর হয়ে গেছে । ঘরে বড় বড় ছায়া । কী এক অমঙ্গল আশঙ্কায় কোশলকুমারী উঠে বসলেন ।

'বাপু ফাঁসির রশি টানবার আগে ওই দোনো মানুষের কানে কানে আমার প্রারথনা বলে দেবে । বলবে কি, তোমাদের কাছে আমার একমাত্র আরজি-পুনরজনম নেবার সময় হলে তোমরা যে কোনো একজন সিধা চলে এসো আমার দুখিনী বহু ফুলমোতিয়ার পেটে । ওখানে বহুত দিন ধরে একজন ইনসানের জন্য জায়গা খালি আছে । শূন্য আছে । অন্ধেরা হোয়ে আছে...

ফুলমোতিয়া কখন যে চলে গেছে । দরজা গলে সকালের আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয় । সেই আলোয় শুখা হওয়ার চেষ্টা করছে দুখিনী মেয়েটা ভারি সাধের অশ্রুজল বিন্দু, ফোঁটায়, ফোঁটায় যা এখনো বিছিয়ে আছে এখানে সেখানে। 'নিখিলের অন্ধকার পাখি'/সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কেন জানি না এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পিকু' ছবির একটা দৃশ্য । পিকু বাগানে রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকছে । চারিদিকে মেঘ করেছে । আরে, রঙ-বাক্সেতো সাদা রঙ নেই ! অথচ সাদা ফুল আঁকতে হবে ? সেই মুহূর্তে পিকুর মা পরপু(ষের সঙ্গে মৈথুনরত ঘরে । নিষ্পাপ পিকু চীৎকার করে মাকে বলে—মা, আমি সাদা ফুল কালো রঙ দিয়ে আঁকছি । পিকু আঁকতে শু(করে । এক ফোঁটা বৃষ্টির জল ওর কালো রঙে আঁকা সাদা ফুলের উপর পড়ে কালো রঙ মুছে যায় ।

'কত(ণ ঘুমিয়েছে সুমন্ত খেয়াল নেই । ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই সে তাকাল ওপারের বিছানায়, সুপ্রিয়ার দিকে, সুপ্রিয়া নেই। সুমন্ত উঠে বসল । চারিদিকে অন্ধকার । বাথ(ম অন্ধকার । একটু অপে(া করল সুমন্ত এবং তারপর তার প্রয়োজনের চাইতেও চিন্তিত হল সুপ্রিয়াকে শোবার জায়গায় না পেয়ে । নিজের খাট থেকে নেমে সুমন্ত দরজা খুলে বারান্দায় গেল । সুপ্রিয়া নেই । ফিরে এসে পাশের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখল প্রায় ভেজানো দরজা ও পরদার ওপার থেকে একটু আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে । আস্তে আস্তে সুমন্ত দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল । একনাগাড়ে খসখস শব্দ ছাড়া জীবনের কোন চিহ্(নেই । ভেজানো দরজাটা আলতো করে ঠেলে মুখ বাড়াল । ভেতরে সুপ্রিয়া একমনে লিখে চলছে। দ্রুত হাত নড়ছে । কলম নড়ছে । নড়ছে না সুপ্রিয়া, লিখে চলেছে তন্ময় হয়ে । অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সুমন্ত। একপাশ থেকে দেখতে পাওয়া সুপ্রিয়াকে । দেখতেই লাগলো নিশ্চলভাবে । সুমন্তর মনে হল যেন বদলে গেছে সুপ্রিয়ার মুখ, ঠোঁট ছুঁচলো হয়ে এসেছে, নাকের পাঠা ফুলে উঠছে, কান যেন ঝুলে পড়ছে একটু সামনের দিকে । এই সেই সুপ্রিয়া, যে সুমন্তকে ভালোবেসেছিল একদিন, অন্তত চিঠিতে তেমনই লিখেছিল সুপ্রিয়ার বিয়ের আগে, দু-দুবার উঁচু পেট নিয়ে রাজহাঁসের মতো পা ফেলে ফেলে ট্যাক্সিতে উঠে চলে গিয়েছিল নার্সিংহোমে । কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল সুমন্ত । হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা অনেক কাল আগের চেনা বাঁশির সুর শুনে মুখ তুলে তাকালো সামনের জানালা দিয়ে দূরে । আবছা আলোর অন্ধকারের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে ইদ্রিস বাঁশি বাজাতে বাজাতে । থলিতে এক রাশ বাঁশি । ইদ্রিসের পেছনে নু(লে, নু(লের পেছনে পেছনে একরাশ অন্ধকার।' আমেরিকা, আমেরিকা /বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সিনেমাতে কোন দৃশ্য কি আস্তে আস্তে, ফেড আউট হচ্ছে ?

চলচ্চিত্রে, সিনেমাটোগ্রাফিতে যাকে বলে 'লাইট স্কীম'—আলোর বিন্যাস পরিকল্পনা, তার একটা চমৎকার সূক্ষ্ম বর্ণনা পাচ্ছি দেবেশ রায়ের 'লগন গান্ধার' উপন্যাসে । —'ঘরের পশ্চিম দিক থেকে আলোর রেখাটা জানালা দিয়ে একটু বেশি চওড়া হয়ে পড়েছে । সুরঞ্জনা নিজের হাতের দিকে না তাকিয়ে বুঝে ফেলে সাড়ে দশটা বেজে গেছে, এমনকি পৌনে এগারটাও হতে পারে । খুব ঘন ঘোর, বৃষ্টির দিন ছাড়া সময় বুঝতে অফিসে ঘড়ি দেখতে হয় না ।

'সুরঞ্জনার কথায় সুষমাদি হাসলেন, সুরঞ্জনাও হেসে আর একটু সরে আসে, তারপর সোজা অফিসের পেছন দিকে হাঁটা দেয় । সুধাংশুবাবু আসছিলেন উল্টোদিক থেকে। তিনি সুরঞ্জনাকে দেখে হাসলেন, সুরঞ্জনাও হাসল, সুরঞ্জনা জানে

তার হাসিটা সুধাংশুবাবু দেখতে পেলেন না । তাদের এই ঘরে বড় দরজা পশ্চিম দিকে, ফলে আলোর একটা বিভ্রাট হয় । যারা দরজার দিক থেকে ভিতরের দিকে আসে তাদের মুখ দেখা যায় না, এমনকি ঘরের ভিতরের বেশ কিছু বাল্ব ও টিউব লাইট জ্বালানো থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় না । আর যারা ভিতর দিক থেকে বাইরে আসে তাদের সারা শরীরে আলো পড়ে ঝলমল করে। সুধাংশুবাবুর হাসির উত্তরে সুরঞ্জনা না হাসলেও কোন (তি ছিল না, সুধাংশুবাবু বুঝতেও পারতেন না । এ কথা সবার জানা থাকা সত্ত্বেও সবাই হাসে।'

...'সুরঞ্জনা সেই ব্যালকনিটির দরজা খোলে । আলো না জ্বালিয়ে নজর তী(করে দেখে ব্যালকনিতে পা ফেলার জায়গা কোথায় । সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় । সুরঞ্জনা দেখে, তার সামনে আকাশ আলোকিত, মেঘপুঞ্জ অদৃশ্য বাতাসে দ্রুত আকাশে পাড়ি দিচ্ছে । ...ঐ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শুক্লপ(র আকাশের মেঘগুলোর পেছন থেকে বেরোন দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনার নিজের সবকিছু খারাপ লাগে । তার এমন একটা নাম, যে নাম, পঁচিশ বছর বয়েসের পরে মানায় না, ঠাট্টা মনে হয়, কেউ ডাকলে মিথ্যা শোনায় । সে সুন্দরী নয়, কোনওদিনই সৌন্দর্য চর্চা করেনি, নিজের চেহারা রাখার জন্য তার কোন ভাবনা ছিল না । ফলে তার চেহারা ইতিমধ্যেই বয়েসের ধ্বংসের পাল্লায় পড়ে গেছে । অন্য মেয়েদের তুলনায় সে কম বয়সে বিয়ে করেছিল, অনেক কম বয়সে তার বাচ্চা হয়েছিল । সে আর দশটা বা একশোটা বা হাজারটা মেয়ের মতো হয়ে যেতে চেয়েছিল । অথচ সেই ঘটনা ত্র(মে হয়ে দাঁড়াল এক প্রতিনিধি । কার প্রতিনিধি সে জানে না, আলোকই বা কার প্রতিনিধি জানে না—কিন্তু তারা আর ঐ একশোজন, হাজার জন, বা এমনকি লাখজনের ভিড়েও মিশে থাকতে পারল না । মিশে যেতে পারলে বেঁচে যেত সুরঞ্জনা । ...সেই নোংরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া চরাচরের দিকে দুচোখ মেলে সুরঞ্জনা গভীর আ(-যে উচ্চারণ করে 'আলোক, আমার আলোক ।

'সেই নোংরা ব্যালকনিতে, সেই মধ্য রাত্রি পেরনো মেঘরাশির গতির নীচে নিজের কত লাঞ্ছিত মুখ নিয়ে সুরঞ্জনা আলোকময়ের সঙ্গে গভীরতম দাম্পত্যে ব্যস্ত হয়ে যায় । যেন তাদের বিবাহ আজ ঘোষিত হয় নি কোন এক অনির্দিষ্ট অতীত থেকে তাদের দাম্পত্য দীর্ঘ সময় ধরে চলে এসেছে । দাম্পত্যের সেই শুদ্ধ কোমল প্রাচীন নিবিড়তায় সুরঞ্জনার চোখ জলে ভরে ওঠে, সেই জলের আড়ালে বাইরের শুক্লপ(আবছা হয়ে যায় ।'

'অন্ধকার সাঁতরে পেলাম ঘড়িটা । আমার ভয়শূন্যতার হেতু ধনুর্বাণের ছিলার মতো পথপ্রদর্শক এক ফালি চাঁদের আলো। দেখি যামিনী তৃতীয় প্রহরে পা দিতে যাচ্ছে । দ্রুত দুয়ার উন্মুক্ত(করা মাত্র চন্দ্রালোক প-াবিত রূপসী নিশি স্তব্ধ করে দিল । স্মিত বিভাষায় আর শিশির বিন্দুতে সজ্জিত কলাবধূরা শরমিত । এতরূপ, ল(কোটি তারকা রাজি নেমে এসে যেন নিভৃতে নিঃশব্দে ইঙ্গিতে অনামা এক রাগিণীতে গেয়ে চলেছে । এই হিমশীতল শর্বরীর নিঃশেষিত আলোর ঝর্ণায় মনের গ-ানি সব ধুয়ে গেল।

নিভৃতে রাত্রি তুমি দাত্রী হয়ে আমার নয়নকে ধন্য করেছ । আমি আশঙ্কিত । দিনের গভীরে তা হারিয়ে ফেলি যদি । সহকর্মীদের নিদ্রাভঙ্গ করে আঙিনায় নিয়ে এলাম । জ্যোৎস্নায় দুটো গ্রহের মতো জেগে আছে দুটো একটি গোলাকৃতি গহ্বরে রাখা মৃন্ময়ী আধারের ছাঁচ । তার অন্তর্নিহিত মোমের ঈপ্সিত মূর্তিটি । নানারকম গাছ ও ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির বস্তুতে আলোছায়ার স্থানটিকে সম্মোহিত করেছে ।'—'ছাঁচের গভীর থেকে সতেজ প্রাণ'/মীরা মুখোপাধ্যায় ।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা এক্সপেরিমেন্ট শেষ করে আমি হোস্টেলে যাব বলে জানালাটি বন্ধ করতে গিয়েছি, দেখি উলটো দিকের নির্জন করিডোরে দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দীপক ও চৈতালি পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছে । চৈতালির পিঠ আমার দিকে । দীপকের বাঁ হাতটি তার কাঁধ বেড়ে বাঁদিকের পাখনাটি বেড়ে আছে । ডানহাতটি তার কোমর বেড়ে রেখেছে । দীপক চৈতালির বাঁগালে কানের নীচে চুম্বন করছে । তার চোখও সেই দিকে নিবদ্ধ । তখন সদ্য বৃষ্টি শেষ হয়েছে । পশ্চিমের আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বহু বর্ণরঞ্জিত । সেই রঙিন আলো দীপক ও চৈতালির ওপর প্রতিফলিত হয়ে তাদের রঞ্জিত করে তুলেছে । দৃশ্যটি বড় সুন্দর ।'—'ভাল মেয়ে' / দেবী খান ।

কেন জানিনা এই বর্ণনা পড়ে আমার মনে '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' ছবিতে ঘরের মধ্যে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে

ধৃতিমান ও দেবশ্রী পরস্পরকে চুম্বনের দৃশ্য ভেসে উঠছে । নিকভিস্টের উপলব্ধিতে এটা কি রোমান্টিক লাইট' 'ম্যাজিক আওয়ার'? আমরা যাকে বলি 'কনে দেখা আলো'! গোধূলি ।

'মন্মথনাথ দন্ডায়মান মেয়েটির দিকে ফের চাইলেন । একটা বিশেষ জায়গায় মেয়েটাকে দাঁড় করানো হয়েছে । জানালা দিয়ে আসছে বিখ্যাত কনে-দেখা আলো । রূপে যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘরখানা ।' —'বোধন ও বিসর্জন' / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

'প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা একত্রে কাটানোর পর মানবেন্দ্রকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যখন নীরবে বিষণ্ণভাবে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলেন সর্দারজী, অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে গেছে ।

গলির ভিতরে পা দিয়েই মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন স্ত্রী ধরিত্রী । ঝড়ে বিধ্বস্ত এক গাছের মতো উদ্বেগের রাত্রি জাগরণের ক্লান্ত শরীরের দীর্ঘ ছায়া ফেলে গ্রিলের ওপর মুখ চেপে ধরে সামনে তাকিয়েছিল ধরিত্রী । দুশ্চিন্তায় এত অন্ধকার ভরেছিল সে দৃষ্টি, তিনি প্রথম মানবেন্দ্রকে ল(্য করেননি । আরও কাছে এগিয়ে আসার পর মানবেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে চোখে খুশির আলো ভোর হল ।...

তবুও বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর ধরিত্রী যখন ভোরের আলোভরা ঘর অন্ধকার করে দিয়ে হাত রাখলেন মানবেন্দ্রের বুকে, তখন হঠাৎ পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা স্বাস্থ্যবান শরীর জুড়ে কান্নার মোচড় এল । সে মোচড় সেই জ্বলন্ত মেয়েটার জগতকে, না এত সব ঝামেলা পেরিয়ে ধরিত্রীর কাছে ফিরতে পারার জন্য, মানবেন্দ্র তা নিজেও জানে না ।...

থানার ঘরটি বড়, কিন্তু স্যাঁতস্যেঁতে আর নোনা ধরা । দেওয়াল জন্মে কোনদিন চুনকামের মুখ দেখেছে বলে মনে হয় না। ঘরের জানালাগুলো বেশ বড় । সূর্যটা যেন ঠিক জানালার বাইরের আকাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছে । এমন জোরালো ভাবে আলো ঢুকছিল ঘরে, সে আলো এমন চোখ ধাঁধানো যে সাদামাটা একটা বাদামি রঙের টেবিলের ওধারে বসে থাকা বড়বাবুকে প্রথমে দেখতে পায়নি মানবেন্দ্র । আলো তার শরীরের রেখাগুলোকে আলোকিত করে মানুষটাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে ।...

এবার আর তাকে পৌঁছে দেওয়া জন্য পুলিশের গাড়ি ছিল না । কোনও মতে ট্যাক্সি ধরে (ধার্ত, হাতের যন্ত্রণায় কাতর মানুষটি যখন বাড়ি ফিরতে পারলেন তত(ণে অন্ধকার নেমে এসেছে চতুর্দিকে ।'—'পুনর্জন্ম' / মীনা ী সেন

একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে লেখিকা চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আলো-ছায়া, সময় কী অসাধারণ দ(তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন । এই আলো-ছায়া, সময়ের পরিকল্পনাকেই চলচ্চিত্রে বলে—লাইফস্কীম, আলোক বিন্যাস পরিকল্পনা । শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা চলচ্চিত্রকে ভিন্ন মাত্রা দেয় ।

'সুড়ঙ্গ একটা দরকার । আলো জ্বালা অথবা আলো না জ্বালা সুড়ঙ্গ । আলো যদি থাকে তবে নীল অথবা হালকা লাল। আর আলো যদি থাকেই তবে নীল না থাকে তবে একেবারে ঘন অন্ধকার হবে না কিছুতেই । সুড়ঙ্গ তো ।

একেবারে নি(ছিদ্র অন্ধকার হলে চলে । অন্ধকার থাকবে, কিন্তু সে অন্ধকার কেমন হবে । হবে একেবারে ভরাভরতি পূর্ণিমার দিনে বিকেলে যদি খুব ঝড় বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টিঝড় সরে যাবার পর সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে তার ভিতর দিয়ে যেমন একটা হালকা আভা ছড়িয়ে থাকে পৃথিবীময়,—দেখা যায় আবার দেখা যায়ও না, তেমনি সামান্য জ্যোৎস্না আভাময় একটা সুড়ঙ্গ দরকার ।...

সাইকেল রাখতে রাখতে রত্নর দিকে তাকিয়ে চোখে অদ্ভুত আলো দেখালো ঝোরা । ওদিকটায়, চাকার ধুলো পড়বে...যেন আজ নতুন আসছি আমি, বলে আবার আলো দেখালো ঝোরার চোখ, কিন্তু খেয়াল করল না ।

কী করে একজন মেয়ে ওইরকম আলো আনে চোখে, কী প্রত্রি(য়ায় ওইরকম তাকায়, সে ভাবল, তাকে কি ওইরকম আলো দেখিয়েছে কেউ, কোনও দিন ? সে মনে করতে পারল না ।

রত্ন বলল, ঝোরার আসবার কোন সময় অসময় নেই । এখন তো আমরা স্নান খাওয়া করব ।

—হ্যাঁ এই বেলা তিনটের সময় তো সভ্য মানুষদের স্নান-খাওয়ার সময়, আমার মনে ছিল না । বলে একটু চুপ করল ঝোরা এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অদ্ভুত আলো দেখালো তার চোখ । বলল, কী জংলি বাবা ।...

‘ঝোরা এত(ণে সোজা তাকাল রত্নর দিকে । তার চোখ ঝকঝক করছে । কিন্তু মুখে আলো নেই ।

কিন্তু সে তো আর রত্নর মতো অমন ভাবে যথাইচ্ছা চলতে পারে না । তাকে বাড়ি ফিরতে হয় সময় মতো । ক’টা বাজে এখন ?

সামনের ওই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় । সে পা চালাল জোরে । আরে, সামনের লোকটা রাস্তায় উঠেই একটা বাড়িতে কড়া নাড়ছে । আলো জ্বলল দরজার সামনে । ঢুকে গেল লোকটা । আলো নিবে গেল ।

...তার মুখে একটা প্রচণ্ড আলো জ্বলে উঠল, আবার নিভে গেল । কেউ বলল, দাঁড়া, মনে হচ্ছে স্টুডেন্ট । বই খাতা রয়েছে, পেন । আবার সেই অন্য গলাটা বলল, কিসের স্টুডেন্ট, লাগা বলছি । আবার ধমক ফিরে এল, থাম । ভুলভাল লোককে নামিয়ে দিস না । ছাড় বলছি ।

তার থুতনি নেড়ে দিল কেউ । উৎকট গন্ধটা দূরে চলে গেল একটু ।

—একজন বলল, বাড়ি কোথায় ?

তার গলা কোনও শব্দ করতে পারল না ।

—কোথায় বাড়ি ?

সে বলল, ওইটা...

—কোনটা, আঁ ?

সে আবার মুখ তুলে বলল, ওইটা...ওইযে... ।

এত(ণে সে দেখল তাদের হাতে বন্দুক, ভোজালি, ওরা হাত দিল আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ অন্ধকার হয়ে এল তার । দুই হাঁটু থেকে হু হু করে শক্তি(বেরিয়ে যেতে লাগল । নরম পুতুলের মতো দেওয়াল ঘসটে সে নামতে লাগল, গড়িয়ে পড়ল নীচে।... সে তখন দেখতে পাচ্ছিল পুকুরের ওপারের একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে । ওটা তাদের বাড়ি । সে থাকে ওই বাড়িতে । ওই বাড়িতে তার বাবা রয়েছে । বোনেরা রয়েছে । ওই বাড়ি থেকেই সে এ(ণি বেরিয়ে এসেছে । ওরা তার হাত ছেড়ে দেবার পর সে ওদের হাতের সরঞ্জামগুলো দেখতে পেয়েছিল । ওই বাড়িরই এত কাছে একেবারে নিঃশব্দে জলকাদায় ভরপুর হয়ে কিংবা চিত হয়ে পড়ে থাকতো সে । তার মনে পড়ছিল যে দরজায় তাকে ঠেসে ধরা হয়েছিল । একটু আগেই সে দরজা খুলেছে। আলো জ্বলছে তার সামনে । কেউ ভেতরে গেছে । একটু আগেই । আর তার বেলায় কেউ সাড়া দিল না আলো জ্বলল না । ভূতের মতো নিশুতি হয়ে রইল চারিদিক ।

এই কয়েকদিন ধরে মাঝে মাঝেই মাথার পিছনে ফুলে ওঠা ব্যথার জায়গায় হাত চলে যাচ্ছিল তার, আর ততবারই তার সামনে ভেসে উঠছিল একটা ঝাপসা মতো মাথা । মাথার মাঝখানটায় টাক । আর সে মাঝে মাঝে দেখছিল একটা আরও ঝাপসা মতো আধো অন্ধকার রাস্তা । টিমটিম করছে একটা লাইটপোস্ট । আর দূরে পুকুরের ওপারে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে, সেদিকে হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে রত্ন । লম্বা, একহারা, ঈষৎ দুলে দুলে হাঁটা রত্ন । সে পিছনে পিছনে যাচ্ছে । প্রাণপণ যাচ্ছে । কিন্তু দূরত্ব কমছে না । হঠাৎ রত্ন তার সামনে ঘুরে বলল, লাগিয়ে দে ওটাকে, লাগিয়ে দে...আর তার পরই উল্টোদিকে ঘুরে একটা টাকমাথা লোক হয়ে গেল রত্ন । সে হাঁসফাঁস করে উঠে বসল বিছানায়...

যেতে যেতে ঝোরা একটু দাঁড়াল । ঝোরার চোখ হঠাৎ সেইরকম আলো দেখালো তাকে, যা রত্নকে দেখায়, তারপর বলল, খুব জেদ না, জিদ্দি । বলে হঠাৎ হাত দিয়ে তার চুলটা ঘেঁটে দিয়ে বেরিয়ে গেল,— সে উঠে পাঞ্জাবি গলায়, বাবা বলল, হ্যাঁ, শোন, রত্ন এসেছিল । তোকে আজ রাতে ওর সঙ্গে খেতে বলেছে । রাতে আর ফেরার দরকার নেই । যা দিনকাল ।

পিসি বলল, কী ভাল ছেলে রে ! দেখলে প্রাণ জুড়ায় । বলল, কত গান করল । বাবা বলল, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে তোর জন্য । দেরি করিস না ।

সে বলল, রত্ন তোমার উপর আলো পড়ছে । একি আলো ? একে তো আলো বলে না...

সে বলল, আপনি এত ল(্য করেছেন ?

মেয়েটা বলল, হ্যাঁ । একেবারে আপনার পাশে বসে । আর আশ্চর্য বলে, মেয়েটা হাসল, আর হাসা-মাত্র এই ঝেঁপে আসা সন্ধ্যাবেলাতেও যেন একটা অবাক করা আলো হয়ে গেল চারিদিকটায় । তবে ফিরে বলল, যাই ?

সে বলল, আচ্ছা ।

মা আর বাচ্চা উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে...

সিঁড়িতে আলো জ্বলছে ।

সেও সিঁড়ি পেল । আর একটু এগিয়ে । নিজের বাসার গেট দিয়ে ঢোকার পর । তবে সিঁড়িটা অন্ধকার, আলো জ্বালায়নি কেউ ।

সে বলল, আর আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না । আমার তো কিছু দেবার নেই আজ ।

—'কেন আপনার ওই মুখ ? ওই কিছু না পাওয়া চোখ, যা সবসময় ছায়ায় ঢাকা থাকত । আজ তার ওপর দিয়ে আমি পলকে পলকে কত রঙের মেঘ ভেসে যেতে দেখলাম । কত আলো জ্বালানো খেয়া নৌকো ভেসে উঠল । আমি তো দেখলাম । আর আপনার মুখের এই মুহূর্তের রেখাগুলো । আগের মুহূর্তের রেখাগুলো ? এর কিছু কি কখনও ভুলতে পারব আমি ? এগুলো সারা জীবনের জন্য আমার সঙ্গে থেকে গেল তো ?'

উল্লেখযোগ্য, এই রচনার শু(তে নিকভিস্টের যে বিচিত্র আলোর কথা উল্লেখ করেছি, সেই বিচিত্র আলো জয় গোস্বামী ব্যবহার করেছেন তার 'সুরঙ্গ ও প্রতির(া' উপন্যাসে । জয়ের উপন্যাস দৃশ্যকাব্য হয়ে আমার কাছে ধরা দেয় নিকভিস্টের বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যময় অনন্ত আলোর ভাষায় ।

'...স(লম্বা গলি । মাঝখানে হলুদ হয়ে যাওয়া আলো পাঁচিলের গা থেকে টিম টিম করে মুখ বাড়িয়েছে ।

চিনতে পারবে তো ? মনে মনে ভাবলেন ধীরেন্দ্রনাথ । কয়েক পা এগোলেন । আরও কিছুটা গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবো। ভাবতে ভাবতে আলোর কাছাকাছি পৌঁছে থমকে গেলেন । এঁদো গলির আকাশে বাতাসে ঝরে পড়ছে স্বর্ণকণ্ঠীর গান, সেই কবেকার গলা, কবেকার গান । আর কণ্ঠস্বর ? তাও তো বেশ । হলুদ হয়ে যাওয়া আলোর নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধীরেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন রেনুকা দাশগুপ্তের মৃদুকণ্ঠে, সেই অতি পরিচিত, সুবিখ্যাত গান, 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ... ।'—'ক্লিনিকের চারজন'/শংকর

'বউমা, ঘরের তো অভাব নেই । একটা ঘর গুছিয়ে দাও সুশীলার জন্য ।' ঘরটা নিজেও দেখেছেন জগন্ময় । নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছেন 'ভোরবেলায় এই ঘরে সূর্যের আলো আসে, সূর্যমুখী ও । পূর্ব আকাশ ওকে পাগল করে দেয়, বউমা ।'

...জানালার কোণ থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে (শুর মশাইয়ের মুখে । সেই আলোয় মানুষটার মুখটা ভিতর থেকে জ্বালান কোনও আগুনে জ্বলছে ।'—'যাবার বেলায়' /শংকর

'আয়নাটা কোথায় ? আয়নাটা কি ওরা নিয়ে গেল ? অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ছে না । হঠাৎ ওই সময়েই টর্চ জ্বলে উঠলো । দূরে উঠোনের এককোণে চুপচাপ সুলগ্না । ওর হাতেই টর্চ । আলো নেই ওর মুখে । তাই মুখটা কান্নায় ভেজা কিনা বোঝা যাচ্ছে না । কিন্তু আয়নায় ওর মুখখানা যে রকম আসে, সেইরকম মুখে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দুর মতো চকচক করে উঠলো ঘাসের ওপর সেই এক টাকার ফুটপাতের আয়নার টুকরোগুলো সুলগ্নারই টর্চের আলোয়।'

—'আয়নায়'/বলরাম বসাক

'হাটবারের হাটখোলা, এমন দিনে এক মাদারি এসে জুটে বসেছে হাটখোলায় । সন্ধে হতে না হতে একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছে । তারপর ডুগডুগি বাজিয়ে বেশ একগাদা লোক জড়ো করে নিয়েছে আর এর ফলে হ্যাজাকের আলোয় চারপাশে বড় বড় ছায়া । দেখলে মনে হয় যেন দৈত্যালয়, দৈত্য ঘুরছে ।'

—'চন্দ্রবাটিকা'/বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

'ইন্টারভিউ' না নিয়েও সে মাধুরীকে নিয়ে অনেক কথা লিখে দিতে পারে। কিন্তু তা করবে না । অনীশদাকে বলে দেবে মাধুরী তার সঙ্গে দেখা করেননি । মাধুরী সম্বন্ধে সব সত্যি কথা লিখে ফেললে মনীষা হঠাৎ করেই আলোচনার শীর্ষে চলে

আসবে । কিন্তু মনীষা তা চায় না । সে যে কী চেয়ে এই সা(াৎকার নিতে এসেছিল তা তো সে নিজেই জানেনা । হয়তো মাকে একবার দেখতে চেয়েছিল সামনাসামনি, কিংবা অন্যকিছু ।

কড়া রোদের থেকে নিজেকে আড়াল করতে ছাতা খুলে বাসস্টপের দিকে এগোতে থাকল মনীষা ।

—'সা(াৎকার'/কল্লোল ব্রহ্মচারী

'চা পান শেষ হতে রামে(র ও সর্বে(র সরসীবালার দুইপাশে এসে বসে । রামে(র দেখতে পায় 'ছোটভাই অসুস্থ মায়ের শীর্ণ দুটো পায়ের পাতা কোলে নিয়ে অসীম মমতায় আঙুল টেনে দিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও সরসীবালার মাথাখানি পরমযত্নে নিজের কোলে টেনে নেয় এবং চুলে বিলি কাটতে থাকে ।

নির্জন স্টেশন চত্বরের লম্বা পিলারের হিমথম ছায়া ফালি কাটছিল সরসীবালার ঠিক মাঝামাঝি, এমন সময় ডাউন ট্রেনের ঘন্টা বাজে ঢং ঢং ঢং, ঘোষণা হয় হাওড়াগামী ট্রেনের আগমনী...ট্রেন আসে, থামে, এবং চলে যায় ।

শিয়রে রামে(র, পায়ের কাছে সর্বে(র —এমন আত্মজ দুই ঈ(রের মধ্যে ভাগের মা ভাগ্যবতী । ঘুম ভাঙে না ।

—'ভাগের মা' / মানব চক্র(বর্তী

রবীন্দ্রনাথ, শেকসপীয়ার, জীবনানন্দ দাশ-এর সাহিত্যের আলো নিয়ে লেখা যায় একটা বই । চলচ্চিত্রের লাইটস্কীমের শৈল্পিক ব্যবহার হয়েছে রোমান পোলনস্কির 'ডেথ অফ এ মাদিন' এবং স্পিলবার্গের 'শিন্ডলারসলিস্ট' ছবিতে । 'ডেথ অফ এ মাদিন' ছবিতে লাইট হাউসের ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ।

'ভাস্কর্যের ভাঙা হত'/পূর্ণেন্দু পত্রী

'পরিচালক ঃ আলো কি প্রস্তুত ?
মনে রাখবেন সময়টা দগ্ধ দ্বিপ্রহর,
ছায়া কালো, রোদ্দুর ধারালো ।
আমরা প্রথম ধরে আছি
দরজাকে ফ্রেমে রেখে ঘরের বাঁ দিক ।
স্টার্ট বললে একটু পরে ধীর পায়ে মাধবী ঢুকবেন ।
হাফ-রাউন্ড টেবিলের উপরে যে ব্রোঞ্জের যুবতী
তার পাশে একটু দাঁড়িয়ে,
জানালার দিকে ঘুরলে মুখটা দুফালি হয়ে যাবে ।
ছুরির ফলার ঈর্ষা নিয়ে
খোলা জানালার রোদ সেটের পর্দায় লেপে আছে ।
মুখ তাই নিমেষ মুখোশ ।
তোমরা রেডি ?
বেশ, মনিটার ।
মাধবী ! আসুন ।
যেটা নেবো সেটা একটা সাইলেন্ট শট ।
শুধু রিঅ্যাকশন ।
মিড লং শট থেকে খুব স্লোলি জুম চার্জ করে
ক্যামেরা এগোবে ।
আপনার বিগ ক্লোজ আপে
আমরা দেখবো রোদে পুড়ছে সাদা গন্ধরাজ ।

এরই উল্টো দিকে—
যা পেয়েছি তা অন্বিষ্ট নয়,
এই আবিষ্কারে যেই
লোডশেডিং-এর মতো দ্রুত নেমে আসে,
তখনই অ্যালার্ম ঘড়ি দমকলের ঘন্টা হয়ে বাজে ।
আপনি যখন ধূপে দেশলায়ের আলো ছোঁয়াচ্ছেন
গোধূলির সন্ধ্যার সেই ম্লান অবেলায়
সে আপনাকে ইবসেনের নোরা বলেছিল
বলেছিল, কুমু মনে হয় ।
এটুকু বুঝে যাওয়া
এইটুকু (ণ-আবিষ্কার
এই তো আসল স্তোত্র, মানবিকতার ।'

'এই বাড়িতে অনেকদিন পর আলো জ্বললো । মানুষ যখন আশাহীনতার শেষ কিনারায় পৌঁছে যায় তখনই আলো জ্বলে ওঠে ।...

'অফিস থেকে ফিরে ঘরের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল শৌর্য । ঘরের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে । বিছানার ওপর বাচ্চা, তার ওপর ঝুঁকে সুনীতা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছেন এবং নাতির সঙ্গে আদরের নিজস্ব ভাষায় অবিরাম বকবক করে চলেছেন । আরও আশ্চর্য, পাশেই দাঁড়িয়ে (মা মুগ্ধচোখে তাদের আদর-খেলা দেখে চলেছে । শৌর্য শিহরিত হল । সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ চলে গেল খোলা জানালার দিকে । শেষবেলার সূর্যের প্রসন্ন কিরণে ঘর ভরে গেছে । এই বাড়িতে সত্যি আলো জ্বলছে ।...

'অনাদিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিছু(ণ বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এগোতে যাবেন, ঘটে গেল কাণ্ড । ছেলের ঘর থেকে নাতির কচি গলার কান্না ভেসে এল । অনাদিরঞ্জন সচকিত হয়ে উঠলেন । কারশেডের আকাশচুম্বী বাতি চতুষ্কোণে নিঃশব্দে জ্বলে উঠল একটার পর একটা । হনহন করে ছেলের ঘরের সামনে এসে সাড়া দিলেন, কী হল ? কান্নাকাটি কীসের? শিশু কান্দে ওদনের তরে ?'—'সরগম'/শুভমানস ঘোষ

বিস্ময়কর এক আলোর সন্ধান পাচ্ছি কিংবদন্তী ত্রি(কেট বিশেষজ্ঞ নেভিল কার্ডসে-এর উপলব্ধিতে—'রঞ্জি ব্যাট করার সময় ইংল্যান্ডের মাঠে একটা অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে থাকত । প্রাচ্যের রহস্যময় আলো ।'

লাইটস্কীম, আলো-ছায়া, মৃত্যুচেতনার অনবদ্য ব্যবহার আছে 'ফরেস্টগাম্প' ছবিতে । যুদ্ধ(ত্রে ফরেস্ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওর আহত ক্যাপটেনকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচায় । হাসপাতালে আহত ক্যাপটেনের পা দুটো কেটে বাদ দিতে হয় । ক্যাপটেন এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না । একদিন রাতে ক্যাপটেন পাশের বেডের ফরেস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরে বলে—তুমি কেন আমাকে বাঁচালে ? আমি কি এভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম ? যুদ্ধ(ত্রে মৃত্যুই ছিল আমার প(গৌরবের ...। ক্যাপটেন তখন আলোতে ফরেস্ট আধো অন্ধকারে । পরে, ছবির প্রায় শেষে, একদিন সকালে ক্যাপটেন সঙ্গিনীকে নিয়ে নকল পায়ে হেঁটে এসে ফরেস্টের বাড়ির সবুজ বাগানে ফরেস্টকে অভিনন্দন জানায় । আর একটা দৃশ্যে, ঘরের মধ্যে জানালার ধারে দিনের আলোতে ফরেস্টের অসুস্থ মা খাটে শুয়ে আছে । ফরেস্ট দূরে আধো অন্ধকারে দরজায় দাঁড়িয়ে। ফরেস্ট মা'র কাছে এসে ছায়াতে বসলে, মা বলে—আমি মরে যাবো,...

ফরেস্ট জিজ্ঞাসা করে—তুমি কেন মরতে চাইছো ? ফরেস্টের মা মারা যাবার পর জানা যায় ওর ক্যান্সার হয়েছিল ।

আরো যা উল্লেখযোগ্য, ফরেস্ট যখন সুখের সাগরে ভাসছে, এমন সময় একদিন ভোরে ফরেস্ট চায়ের ট্রে হাতে স্ত্রী জেনির ঘরে ঢুকে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখে, জানালার পাশের খাটে ভোরের আলোয় জেনি এমন ভাবে ঘুমিয়ে আছে,

যেন ও আর এই পৃথিবীতে নেই । ফরেস্ট জেনির কাছে এসে ছায়াতে চেয়ারে বসে । আমাদের মনে পড়ে যায়, ফরেস্ট এই ভাবেই মা'র খাটের পাশে এসে বসেছিল একদিন । হঠাৎ জেনি চোখ খোলে, মৃদু হাসে, আপন মনে বলে—আমি আর বাঁচবো না । ....ছায়াতে ফরেস্ট নির্বাক, অবাক । পরের দৃশ্যে আমরা দেখি সবুজ মাঠের মধ্যে জেনির স্মৃতি ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে ফরেস্ট কাঁদছে ।

হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত 'একই অঙ্গে এত রূপ' ছবিতে একটা দৃশ্যে আলোর ছায়ার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । সৌমিত্র মাধবীর ঘরে ঢুকলে মাধবী এক এক করে জানালাগুলো বন্ধ করে দেয় । সৌমিত্রের আত্র(মণের উত্তর খুঁজে না পেয়ে বন্ধ জানালার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে । তারপর দৌড়ে ঘরের বাইরে আসে আলোতে । কিন্তু উপায় ? আলো-ছায়ার মধ্যে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, মুখে অনেক ছায়া কাঁপে । আলো-ছায়ার মধ্যেই এগিয়ে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে ভাবে সমাধান । আবার সৌমিত্র চলে যাওয়ার পর ঘরে ঢুকে এক এক করে জানালা খুলে দেয়। জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো আসে ঘরে ।

'সুভাগা ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন (তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল ! তারপর গু(গু(গম্ভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল লোহার দরজা যেন আগুনে অর্দ্রণে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন, সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না । সুভাগা দুই হাতে মুখ ঢেকে বললেন, —'হে দেব র(া কর, (মা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায় ।' সূর্যদেব বললেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই । বৎসে, বর প্রার্থনা কর ।' বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ত্র(মশ ীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা অধরার সিঁদুরের মত সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল ।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন (তখন পূর্বে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন । সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ত্র(মশই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল । তিনি মনে মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশী দিন ধরে রাখা যাবে না।'

—'শিলাদিত্য' /অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

'সব কিছুর ভাগ দেওয়া যায় কিন্তু কিছু স্মৃতি যা মুহূর্তে একান্তে একজনেরই চিরকাল থেকে যায় । আসলে এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ঘুণা(রেও বুঝতে পারা যায়নি । ফিতে খুঁজতে গিয়ে ট্রাঙ্কের অন্ধকারে যে এক আকাশ রোদ ঝলমলিয়ে উঠবে কে তা জানত !'—'স্বর্ণরেণু' দিব্যেশ লাহিড়ী

'আমার (মতা আছে,
মর্যাদা আছে,
কিছু পরিচিতিও আছে ।
তবু মনে হয় আমি একা,
অন্ধকারে কী যেন খুঁজছি ।'—অটল বিহারী বাজপেয়ী

'আজ অনেক(ণ কাঁদব ।
কেন ?
নিজের জন্য—

এখনও সেই দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে প্রিয়ব্রত । একবারও পিছনে না তাকিয়ে মন্থর পা ফেলে, আলোর ভিতর দিয়ে ত্র(মশ ছায়ার ভিতরে ঢুকে পড়ছে অদিতি । তারপর হারিয়ে গেল ।—'মাত্র কয়েকদিন'/দিব্যেন্দু পালিত

'আমি বোধহয় আর গ্রুপে থাকতে পারবো না ।'

জলধিদা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—'আর কোথাও বেটার চান্স পাচ্ছো ?'

সুশান্ত অতি দুঃখেও একটু হাসলো । বললে—'আপনি আমাকে অতো ছোট ভাববেন না । আমি চান্সের লোভে পালিয়ে যাচ্ছি না ।'

জলধিদা সুশান্তের হাতের ওপর মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন—'রাগ কোরো না । এমনিতে কেউ চান্স পেয়ে চ'লে গেলে দলের মধ্যে তাকে গালাগালি দিই বটে, সেটা খালি বাকি লোকের 'মরাল' ঠিক রাখার জন্যে । কিন্তু মনে মনে তো জানি যে-ভাবে সে বেঁচে যাবে । এখানে তো কা(র কোনও ভবিষ্যৎ নেই । আমার বাবা সারাজীবন খেটে খানকয়েক ছোট ছোট বাড়ি ক'রে গেছেন তাই না আমি কেবল নবনাট্য ক'রে কাটিয়ে দিলাম । কিন্তু সবাই কী করে পারবে ? অতোবড়ো উৎসাহী কর্মী ছিল অনিল,—অনিল রায়,—সে-ই পারলো ? তাই কেউ যদি চান্স পায়—বিশেষ ক'রে চাকরীতে চান্স পায়—আমি খুব খুশী হই । ভাবি, যাক এর সংসারটা অন্তত নিরাপদ । ক্লাবে তাকে গাল দিই, কিন্তু মনে খুশী হই ।'

সুশান্ত বিস্মিত হ'য়ে বললে—'আপনি একজন পুরানো লোক । আপনার মনেই যদি এরকম সন্দেহ থাকে তাহলে এ আন্দোলন টিকবে কী ক'রে ?'

জলধিদা হাসলেন, বললেন—'টিকবে, টিকবে । আমরা যেমন ক'রে চেয়েছি তেমন ক'রে টিকবে না (কিন্তু দেশের লোক যেমন ক'রে চায় তেমন করেই টিকবে ।—কীরকম জানো ? বুদ্ধ একটা ধর্ম প্রচার করলেন । কিন্তু সে ধর্ম বড়ো কঠোর, সেটা মানতে গেলে দেশের লোককে বদলে যেতে হয় । তাই তারা নিজেদের স্থূলতা দিয়ে বুদ্ধকেই বদলে নিলে । সেইটুকুই টিকলো। আমাদের এই হিন্দুধর্মের কথাই ধরো না, একদিন তো বলেছিল যে, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্, তেনাহং কিং কুর্য্যাম্', যা অমৃত নয়, তাকে নিয়ে আমি কী করবো । বলেছিল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ' কিন্তু লোকে সেটাকে টেনে এনে হাঁচি, টিকটিকি, ওলাপুজো, মনসাপুজোয় নামিয়ে ফেললো, এবং এটাই টিকলো । সেই রকম নবনাট্যের দু'একটা প্যাঁচ হয়তো দেশের থিয়েটারে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে । সেইটুকুই টিকবে ।'

সুশান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল । জলধিদা এইসব কথা বলছেন একথা সে নিজের কানে না শুনলে বি(্বাস করতো না। রাস্তার আলো গাড়ির মধ্যে এক একবার চম্‌কে দিয়ে ত(নি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে । সেই আলোতে জলধিদার মুখে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের ভাঙন লেগেছে । চরম হতাশায় যে ঔদাসীন্য আসে তারই ছাপ তাঁর চোখে । সুশান্তর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন,—'বেশী বক্ত(তা দিচ্ছি, না ? তোমাকে বলতে ইচ্ছা হোল, তাই বললাম।'—

খানিক(ণ চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—'আমরা তাহলে কী করবো ?'—'অরণ্যে'/শম্ভু মিত্র

বারান্দার এক কোণে ছায়াতে দাঁড়িয়ে প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য অপে(া করছে। বারান্দার মাঝখানে লম্বা আলোর ফালি। দূরে, ঘর থেকে বেরিয়ে প্রেমিক ছায়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে ছায়াতে প্রেমিকার পাশে দাঁড়ায়। দু'জনের মাঝখানে এক ফালি আলো। প্রেমিকা অবাক হয়ে বলে—'তুমি এখানে কাজ কর! আগে বলনি তো? অবশ্য এখানে কাজ করলে বলার মত আছে কী। অনেক (তি করেছ। আর সম্পর্ক রেখো না।' এই বলে প্রেমিকা চলে যায়। মলয় ভট্টাচার্যের 'কাহিনী' ছবির একটা দৃশ্য।

'অন্ধকার মাখা ঘোরানো সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে আসার সময় সেই ছোটবেলার থেকেই চু-কিতকিত খেলার স্টাইল, বিত্র(ম একটা কথাই বলে, কালো যায়—আলো হয়। কালো যায়—আলো হয়...। এক নি(্বাসে। একবারও দম না ছেড়ে।

সিঁড়ি শেষ হয়। কালো ঘুচে যায়। বিত্র(ম বলে, আহাঃ ! আলো ! ছোটবেলা থেকে বাইরের এই আলোটা দেখতে পাবার যে কী লোভ ! ... কী আশ্চর্য বি(্বকবি ? আপনি আর বি(্ববন্ধু এক পাড়ার । এক গলি না হোক পাশের গলি তো ? আর প্রায় এক সময়ের। তাও আলাপ হয়নি ? বি(্ববন্ধু আপনার থেকে এজ-এ বড় । কিন্তু আপনি ? ইমেজ-এ একশো মাইল এগিয়ে ছিলেন। সেই জন্যে বুঝি আলাপে অ(চি ? ইস বি(্বকবি, ইমেজটাকে অল্প ছোট করে আমাদের পরিবারে যদি একটু আলো দিতেন...। এই হিউজ ফ্যামিলিতে আলোর বড্ড অভাব।

...বাবা ? ইউ সিনিয়ার। আই জুনিয়ার। দু দুটো রেয়ার ব্যাঙ। যারা মানুষ থেকে ব্যাঙ হয়ে গেল। কী দুঃখের। কী

লজ্জার। বংশের একটা ব্যাপার আছে। রক্তে(র। ঠিক কি না বলো? কত কী ভাবতুম...। আমি নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু এখন তো দেখছি ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙই হয়েছি।

ওরা সেই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে প্রায় একতলায় নেমে আসছে। আর কয়েকটা সিঁড়ির পরই বাইরের আলো পাবে। বিত্র(ম হঠাৎ বাচ্চা বেলার মতন মনে মনে বলে উঠল,—কালো থাক । কালো থাক । কালো থাক । কালো থাক । আমি আর আলো চাই না। সহ্য হবে না।'—শব্দজব্দ/কুনালকিশোর ঘোষ

'ঘাড়ে, কানের পাশে কোনও আঘাতের চিহ্(আছে কিনা দেখার জন্য টর্চটা বার করলাম। সুইচ টিপতেই মেয়েটা যেন বলে উঠল, আঃ নেভান না আলোটা। আলোটা নেভানোর আগে চোখ পড়ে গেল, মেয়েটার নাকের নীচে ছোট্ট একটা তিল, জীবন্ত ।'

উঠে দাঁড়ালাম। মায়ের মুখে যথেষ্ট আলো কিন্তু মুখটা একদম মরে গেছে। মুখের ওপর বিষাদ ছায়াটাও অনেক(ণ হল মৃত । চোখের জল গড়িয়ে শুকিয়ে আছে গালে। যেমন স্রোত সরে গেলে দাগ শুকিয়ে থাকে মোহনার চরে।...

তুমি যে ঝকঝকে অফিসে চাকরি করতে যাচ্ছ, যাদের ফার্নিচারে, দেওয়ালে, টাইলসে এক চিলতে দাগ পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। সেই অফিসের ডিরেক্টরের ঘরের মধ্যে আরেকটা ঘর আছে। অ্যান্টি চেম্বার। রিসেপশনে যে কটা সুন্দরী মেয়েকে দেখছ, তারা প্রত্যেকেই ওই ঘরের অন্ধকার মেখেছে।...—রত্নাকরের বাড়ি/সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

'আদিত্য চোখের পাতা খুলল । জয়মোহন দেওয়ালের ছবির দিকেই তাকিয়ে আছেন। টিউবলাইটের আলো টের্ছাভাবে পড়ে তাঁর মুখের অর্ধাংশ আলোকিত, বাকিটা ছায়াময় । যেটুকু দৃশ্যমান সেটুকুনিও যেন বড় বেশী ক্লিষ্ট, ভাঙাচোরা, বড় বেশি বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল আদিত্যর ...

মেয়ে সন্দিগ্ধ চোখে বাবাকে দেখছিল,—মার সঙ্গে দেখা হয়েছে ? মাকে ডেকে দেব ?

—আহা, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দে । আলো নিবিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে যা । ঘর ধূসর অন্ধকারে ভরে গেছে। দয়ামায়াহীন, কর্কশ অন্ধকার । এ অন্ধকার মানুষকে একটুও রেহাই দেয় না । চোখ বন্ধ রেখেও অন্ধকারের ত্রূ(রতা এড়াতে পারছিল না আদিত্য । তার সমস্ত স্নায়ু দু'আঙুলে পেঁচিয়ে যেন টানছে কোন আলোহীন শক্তি(। টাং টাং শব্দ অনুরণিত হচ্ছে মাথায় ।—'কাছের মানুষ' / সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সাহিত্যের চিত্রকল্প ও শব্দ বর্ণনা কীভাবে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত হয় তার একটা সুন্দর নিদর্শন আছে শ্যামলী মহাপাত্র-এর 'নিবারণ ফেরেনি' গল্পে—'উত্তেজনায় টানটান তনু ঘেমে নেয়ে উঠল । চারিদিক থেকে অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতা একই সঙ্গে যেন, হাত ধরাধরি করে ওকে চেপে ধরল । চিৎকার করে ও কাঁদতে চাইল, তুমি কোথায় ? এখনও কি তোমার ফেরার সময় হল না ? ক'টা বাজে সে খবরও তুমি রাখ না ? হঠাৎ দূরের গির্জায় ঘড়িতে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে দু'টোর ঘন্টা পড়ল। যেন দু'টি শব্দ — নিবারণ ফেরেনি ।'

শঙ্খ ঘোষ 'কবির অভিপ্রায়' এ প্র(ো তুলেছেন—'আলো এসে পড়ে বটে, কিন্তু ঠিক জায়গায় তো ? কোথায় লাগে আলো? ঠিক জায়গায় তো ?'

'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্তি—'বনে-বনে সূর্যের আলোয় কেন চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে কেন না আলোর জন্য কাঁদছে সারারাত ।'

'একদিন অন্ধকূপ থেকে ছাড়া পাব । আহা সেদিন কত আনন্দই না হবে । ...

সিবেস্টিনি হোপ নিয়ে যারা বাস করেন তাদের অন্ধকূপে থাকতে হয় । সেই অন্ধকূপেও সব মানুষেরাই আছে । গাঢ় অন্ধকার এক অংশ যেখানে কোনও আলো পৌঁছায় না । মানুষকে নানান ধরনের আলোকবর্তিকা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। বুদ্ধির আলো, জ্ঞানের আলো, ভালবাসার আলো, মমতার আলো, আনন্দের আলো । কোনও আলোই সেই অন্ধকূপের অন্ধকার দূর করতে পারে না ।

যতই আলো ফেলা যায় অন্ধকূপের অন্ধকার ততই গাঢ় হয় । অন্ধকূপ আলোকিত করার জন্য বিশেষ ধরনের আলো দরকার । মানুষকে সেই আলো দেওয়া হয়নি । সেই আলো প্রতিটি মানুষকে আলাদা আলাদা ভাবে আবিষ্কার করতে হয় ।'

—'হিমু' /হুমায়ুন আহমেদ

।। শট ।।

যারা চলচ্চিত্র, সিনেমা বিষয়ে আগ্রহী, তারা নিশ্চয় জানেন, সিনেমা, চলচ্চিত্র তৈরি করতে হলে সুটিং করতে হয় । যাদের সুটিং দেখার অভিজ্ঞতা আছে তারা অবশ্যই 'অ্যাকশন' এবং 'কাট' শব্দ দু'টোর সঙ্গে পরিচিত ।

'একটা তো মনে পড়ে যে তখনও সুটিং এর অভ্যাসটা ঠিকমত হয়নি, শট নেবার পরে যে কাট বলতে হয় এবং কাট বললে ক্যামেরা থামে তা না হলে চলতে থাকে সেটা আমার খেয়াল থাকতো না—অনেক সময়ই আমি কাট বলতে ভুলে যেতাম আর বংশী পেছন থেকে বলতো মানিক, কাট বলো, কাট বলো ক্যামেরা চলছে ।'—সত্যজিৎ রায়

পরিচালক 'ক্যামেরা' বললে, ক্যামেরা চালু হয় এবং অ্যাকশন বললে, অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় শু(করেন । তারপর পরিচালক 'কাট' বললে, ক্যামেরা থামে । এই 'অ্যাকশন' থেকে 'কাট' পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় বা ফিল্মটা একটা 'শট', যা একান্তভাবেই চলচ্চিত্রের মৌল উপাদান । স্বাভাবিকভাবে একটা শটের স্থায়িত্ব কয়েকটা ফ্রেম, তা'কয়েক সেকেণ্ড থেকে দশ-মিনিট পর্যন্ত হতে পারে ।

'শট' চলচ্চিত্রের 'একক'। অসংখ্য শট জুড়ে সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র—শটের সমন্বয়, সংঘাত, মিথ(ি য়া—থিসিস, অ্যান্টিথিসিস—সিনথিসিস রূপ। চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ, জ্যামিতি ও গণিত । যাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্র সম্পাদনা । চলচ্চিত্রের ভাষা—সিনেমা গ্রাফিক্স । ক্যামেরা থেকে বিষয়বস্তুর অবস্থানের দূরত্ব, ক্যামেরার সচলতা, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, ফোকাসের গভীরতা, ফ্রেমে চরিত্রের সংখ্যা অবলম্বন করে শটকে বিভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ।

শট—ক্যামেরা থেকে বিষয়বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী ঃ—

১। **বিগ ক্লোজ আপ** ঃ — ফ্রেমে একটা বা দুটো চোখ, ঠোঁট ।
২। **বিগ ক্লোজ শট** ঃ — ফ্রেমে সমস্ত মুখমণ্ডল ।
৩। **ক্লোজ শট** ঃ — পাশপোর্ট ছবির মত ফ্রেম ।
৪। **মিড শট** ঃ — মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ফ্রেম ।
৫। **লং শট** ঃ — একটা সম্পূর্ণ মানুষের আকৃতির ফ্রেম ।
৬। **ভিস্টা বা এক্সট্রিম লং শট** ঃ — বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফ্রেম ।

শট — ক্যামেরার সচলতা বা গতিশীলতা অনুযায়ী ঃ—

১। **প্যান শট** ঃ— ক্যামেরার কেন্দ্র স্থির রেখে ডানে বা বাঁয়ে ঘুরিয়ে যে শট নেওয়া হয় ।

২। **টিল্ড আপ এবং টিল্ড ডাউন শট** ঃ—ক্যামেরার কেন্দ্র স্থির রেখে দৃষ্টিকোণ বা অ(পথ ত্র(মে উপরে তুলে বা নিচে নামিয়ে যে শট নেওয়া হয় ।

৩। **ট্রলি বা ডলি শট** ঃ—ক্যামেরা ট্রলি বা ডলির উপরে বসিয়ে, ক্যামেরাকে ইচ্ছামত গতিশীল করে সামনে এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে এনে কিংবা ডানে-বাঁয়ে নিয়ে গিয়ে যে শট নেওয়া হয় । বিভিন্ন রকম ট্রলি শট আছে । যেমন—'রাউন্ড-ট্রলি', 'হাফ-রাউন্ড', 'এস-ট্রলি', 'টি-ট্রলি', 'ইউ-ট্রলি' শট ইত্যাদি ।

৪। **ক্রে(ন শট** ঃ—ক্যামেরা ক্রে(নের উপর বসিয়ে ইচ্ছামত গতিশীল করে উপর থেকে নিচে নামিয়ে কিংবা নিচ

থেকে উপরে তুলে বা ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা বাঁ থেকে ডানদিকে ঘুরিয়ে, সরিয়ে যে শট নেওয়া হয় ।

শট — ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ঃ—

১। **আই-লেভেল শট** ঃ— মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে শট নেওয়া হয় ।

২। **হাই এবং লো-অ্যাঙ্গেল শট** ঃ— আই-লেভেল থেকে উপরে বা নিচে ক্যামেরা রেখে যে শট নেওয়া হয় । অর্থাৎ যে শটে উপর থেকে নিচে দেখার এবং নিচ থেকে উপরে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি হয় ।

৩। **ডিরেকটর এবং ক্যারেকটার পার্সপেকটিভ শট** ঃ— পরিচালকের দৃষ্টিকোণ থেকে যে শটগুলো নেওয়া হয় তাকে বলে ডিরেকটর পার্সপেকটিভ এবং অভিনীত চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে যে শটগুলো নেওয়া হয় তাকে বলে ক্যারেকটার পার্সপেকটিভ শট । ডিরেকটর পার্সপেকটিভ শটকে ড্রামাটিক বা অডিয়েন্স পার্সপেকটিভ শটও বলে ।

শট —চরিত্রের গু(ত্ব, অবস্থান এবং ফোকাসের গভীরতা অনুযায়ী ঃ—

১। ফ্রেমের দু'টো চরিত্রকেই সমান প্রাধান্য দিলে বা সব চরিত্র, সব কিছু ফোকাসে, স্পষ্ট থাকলে তাকে বলে ইকুয়াল প্রেফারেন্স বা 'ই-পি' শট ।

২। ফ্রেমের দু'টো চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন চরিত্রকে প্রাধান্য দিলে বা কোন বস্তুকে শুধু মাত্র ফোকাসে রেখে আর সব চরিত্র বা সবকিছু আউট অফ ফোকাস, অস্পষ্ট করে যে শট নেওয়া হয় তাকে বলে সাজেশন প্রেফারেন্স বা 'এস-পি' শট ।

ফোকাসের গভীরতা ছাড়াও ফ্রেমের চরিত্রের বা বস্তুর আকৃতি, অবস্থান এবং আরও অনেক রকম ভাবে বিশেষ চরিত্রকে গু(ত্ব দিয়ে সাজেশন প্রেফারেন্স শটের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় । এছাড়া ফ্রেমে চরিত্রের সংখ্যা অনুযায়ী 'সোলা', 'কমপোজিট' বা ওয়ান-টু-থ্রি...শট ইত্যাদি কিংবা ফ্রেমে চরিত্রের জ্যামিতিক অবস্থান অনুযায়ী 'ডায়াগোনাল', 'ট্র্যাঙ্গুলার', 'সারকুলার' কিংবা চরিত্রের পিছন দিক থেকে কাঁধের পাশ দিয়ে যে শট নেওয়া হয় তাকে 'ওভার দি-সোলডার' কিংবা ক্যামেরা-কেন্দ্র স্থির রেখে ফ্রেমকে উপর-নিচ ঘুরিয়ে, কাত করে যে শট নেওয়া হয় তাকে 'ল্যাটারাল' শট বলে । আবার লেন্সের ব্যবহার অনুযায়ী নরমাল, ওয়াইড, টেলি এবং জুম শট । এছাড়া, আছে ফ্রেমে চরিত্র বা বস্তুর অবস্থান ও গতি অনুযায়ী 'স্ট্যাটিক' এবং 'ডায়নামিক', কনস্ট্যান্ট, কনট্রাস্টিং এবং নিউট্রাল শট ।

শটকে যে ভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, শটের বৈশিষ্ট্য, রহস্য, চরিত্র এই যে, শট শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায়, চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে, ভাষায় পরস্পরের সংগে অদৃশ্য শৈল্পিক সম্পর্কে গভীর আবদ্ধ-যুক্ত(। যার ফলে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত, ভাবময়, ছন্দোবদ্ধ এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র্যে মহিমান্বিত । তাই শট ডিভিশন, শট বিভাজন নিছক খেয়াল খুশির প্রকাশ নয়, চলচ্চিত্রের গঠন পদ্ধতি, প্রকাশভঙ্গি । যার আছে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, ব্যাকরণ । জ্যামিতি এবং গণিত । তাল, লয়, সুর ও ছন্দ ।

শট বিভাজন এক আশ্চর্য ত্র(ম-প্রসরমান চলচ্চিত্র বিজ্ঞান । চলচ্চিত্রের সৃজনশীল প্রকাশভঙ্গি । আর একটু এগিয়ে বলা যায় পরিচালকের ট্রিটমেন্ট, শৈলী । শব্দের সমন্বয়ে সিনেমা গ্রাফিক্স । চলচ্চিত্রের ভাষা — মিশাঁসেন ।

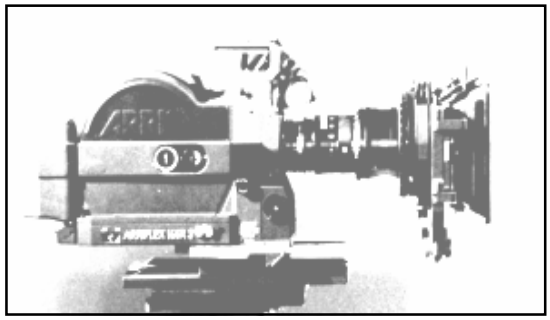

।। চলচ্চিত্রায়ণের ধারাবাহিকতা ।।

সিনেমা, চলচ্চিত্র একাধিক শটের সমন্বয়ে তৈরী একটা নির্দিষ্ট সময়ের একাধিক দৃশ্যের ধারাবাহিক প্রবাহ । তাই চলচ্চিত্র নির্মাণের সর্বস্তরে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় । এই ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবে বজায় না থাকলে দর্শকের দৃষ্টিতে, মনে, চিন্তা-ভাবনায় আঘাত লাগে । দর্শক বিভ্রান্ত হয় । চলচ্চিত্রের নির্মাণ পদ্ধতিতে জটিলতা দেখা দেয়। চলচ্চিত্রের ভাষা হয়ে যায় দুর্বল, দুর্বোধ্য, বিকৃত । জনসংযোগ ব্যাহত হয় ।

যেহেতু একাধিক শটের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্র, তাই চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং চলমান কোনও কিছুর গতির ধারাবাহিকতা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃষ্টি, শারীরিক ভঙ্গি, পোশাকের, ফ্রেমের বিষয়বস্তুর, আলোর ধারাবাহিকতা র(া করা অত্যন্ত কঠিন কাজ । যদি চলচ্চিত্র একটা মাত্র শটে তৈরী করা যেত, তবে ধারাবাহিকতার কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকত না । যদি চলচ্চিত্রের কোনও অংশে হঠাৎ বিনা কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃষ্টির, অবস্থানের, ভঙ্গির, পোশাকের, গতির বা চলমান কোনও কিছুর গতির যে কোন একটার ধারাবাহিকতা বজায় না থাকে—এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবে দর্শকদের বিভ্রান্ত করবে ।

চলচ্চিত্র নিজস্ব পৃথিবীতে বাস করে । চলচ্চিত্রের আছে নিজস্ব ভাষা, নিয়ম-কানুন এবং ব্যাকরণ। ক্যামেরার অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা দৃশ্যের, শটের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র । তাই, কীভাবে ক্যামেরা দৃশ্যগ্রহণ করছে সেটাই গু(ত্বপূর্ণ, বাস্তব নয় । এই পরিপ্রে(তে চলচ্চিত্র—বাস্তব বনাম ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের সংঘাত । অর্থাৎ বাস্তবে কী আছে—নেই সেটা বিচার্য নয়, ক্যামেরা পর্দায় কীভাবে বাস্তবকে প্রতিফলিত করছে সেটাই গু(ত্বপূর্ণ । যখন দৃশ্যগ্রহণ করা হয়, তখন বস্তুর রূপ কীরকম সেটা থেকে অধিকতর গু(ত্বপূর্ণ ক্যামেরার মাধ্যমে বস্তুটি পর্দায় কেমন দেখাবে দর্শকের সামনে ।

চলচ্চিত্রে দৃশ্যগ্রহণের ে(ত্রে 'দৃশ্য-পরিচালনা' অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বিষয় । চলচ্চিত্রে দুই ধরনের 'দৃশ্য-পরিচালনা' বর্তমান। 'স্থিতিশীল দৃশ্য পরিচালনা' এবং 'গতিশীল দৃশ্য পরিচালনা ।' ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তায় গতিশীল দৃশ্য পরিচালনা অধিকতর গু(ত্ব দাবী করে ।

গতিশীল দৃশ্য পরিচালনা ঃ

১। অপরিবর্তনীয় গতি—ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিক কিংবা ডানদিক থেকে বাঁদিকের ধারাবাহিক গতিপ্রবাহ ।

২। পরিবর্তনীয় দৃশ্য পরিচালনা—একই সঙ্গে ফ্রেমের ডানদিক থেকে বাঁদিক এবং বামদিক থেকে ডানদিকের ধারাবাহিক গতিপ্রবাহ ।

৩। নিরপে(গতি—ক্যামেরার লেন্সের দিকে কিংবা লেন্স থেকে ফ্রেমের কেন্দ্রের দিকের ধারাবাহিক গতিপ্রবাহ ।

অপরিবর্তনীয় গতির দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা চলমান বস্তুর গতির ধারাবাহিকতা সর্বদা নির্দিষ্ট দিকে বা একমুখী। অর্থাৎ কতকগুলি শটে একজন হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে, একটা গাড়ি, জাহাজ চলছে, প্ে-ন উড়ছে, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে দেখাতে হলে, এদের গতি সর্বদা একমুখী রাখতে হয় । অর্থাৎ প্রথম শটে চরিত্র যদি ফ্রেমের বামদিকে ঢুকে ডানদিকে বের হয়, তাহলে পরের শটে আবার ফ্রেমের বামদিকে ঢুকে ডানদিকে বের হয়ে যেতে হবে চরিত্রকে । অথার্ৎ গতি একমুখী, ত্র(মাগত ডানদিকে রাখতে হবে । এই শট-মালার মধ্যে যদি কোনও শটে হঠাৎ দেখা যায় ঐ চলমান ব্যক্তি(আগের শটের পরিপ্রে(তে বিপরীত দিকে যাচ্ছে বিনা কারণে, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে হবে ব্যক্তি(বা বস্তুর দিক পরিবর্তন হয়েছে । ঘুরে

গেছে, বুঝিবা ফিরে আসছে আগের, শু(র জায়গায় । ফলে, এই শট-মালার মধ্যে বজায় থাকল না অপরিবর্তনীয় গতির ধারাবাহিকতা ।

পর্দায়, চলচ্চিত্রে একজন ব্যক্তি(বা বস্তুর নির্দিষ্ট যাত্রাপথ দেখাতে গেলে অপরিবর্তনীয় গতির ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে ।

একমুখী, অপরিবর্তনীয় গতির একটা চমৎকার উদাহরণ তপন সিংহের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ছবিতে মাঠের জলাজমির মধ্য দিয়ে পাল্কি করে গান গাইতে গাইতে বর-বউ আসছে দৃশ্যটা । এত দীর্ঘ মনোরম শৈল্পিক শট ভারতীয় ছবিতে খুব কমই আছে । যে কোনও গাড়ী, বাস, ট্রেন, জাহাজ, প্ে-নের ভিতরের দৃশ্যগ্রহণের ে(ত্রে গতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । প্রথম শটে হয়তো দেখানো হল গাড়িটা ফ্রেমের ডানদিকে থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে । এইবার গাড়ির ভিতরে শট নিতে হলে আগের শটের গতির ধারাবাহিকতা, একমুখী ভাব বজায় রাখতে হবে । খুব স্বাভাবিক কারণেই ক্যামেরা একাধিকবার দৃষ্টিকোণ এবং স্থান পরিবর্তন করবে । কিন্তু সর্বদাই গতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে পূর্বের শটের পরিপ্রে(ত অনুযায়ী ।

পরিবর্তনীয় গতির দৃশ্য ঃ

পরিবর্তনীয় গতির দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলমান বস্তুর বিপরীতমুখী গতি থাকে । আবার দু-দশজন ব্যক্তি(বা দুটো চলমান বস্তু একে অপরের মুখোমুখী হতে পারে ফ্রেমের বিপরীত দিক থেকে যাত্রা শু(করে কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে । যদি কোনও ব্যক্তি(কে দেখাতে হয় যে বাড়ি থেকে বের হয়ে অফিস যাচ্ছে, আবার পরে বাড়ি ফিরে আসছে, তবে এই ে(ত্রে অবশ্যই পরিবর্তনীয় গতির দৃশ্য ব্যবহার করতে হবে । অর্থাৎ দৃশ্যে বিপরীতমুখী গতি থাকবে । প্রথমে যদি দেখানো হয় ঐ ব্যক্তি(বাড়ি থেকে বের হয়ে ফ্রেমের বামদিকে ঢুকে ডানদিকে অফিস যাচ্ছে, তবে অফিস ফেরতের দৃশ্যে অবশ্যই দেখাতে হবে ঐ ব্যক্তি(অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে ফ্রেমের ডানদিকে ঢুকে বামদিকে বের হয়ে । এই বিপরীতমুখী গতি দর্শককে প্রমাণ করে ঐ ব্যক্তি(র বাড়ি এবং অফিসের অবস্থান, অন্য কোন ইঙ্গিত ছাড়াই ।

পরস্পরের মুখোমুখী হচ্ছে দেখাতে হলে, দু'ব্যক্তি(বা দলকে বিপরীতমুখী গতি ব্যবহার করতে হবে । প্রথম ব্যক্তি(বা দলকে ডানদিক দিয়ে ঢুকালে, দ্বিতীয় ব্যক্তি(বা দলকে বামদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ডানদিক দিয়ে বের করতে হবে । তবেই দর্শকের মনে হবে দু'ব্যক্তি(বা দু'টো দল পরস্পরের মুখোমুখী হচ্ছে । ল(ণীয় যে, এই ধরনের দৃশ্যায়ন, সংলাপ বা নেপথ্যের অন্য কোনও কিছুর ব্যবহার বা ইঙ্গিত ছাড়া শুধুমাত্র দৃশ্যের সাহায্যে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে স(ম হচ্ছে । আরও উল্লেখযোগ্য যে, পরিবর্তনীয় বা বিপরীতমুখী গতির দৃশ্যের মধ্যে অদ্ভুত এক নাটকীয়তা, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা আছে। যা কাহিনীর কৌতূহল বজায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যায় চরম বিন্দুতে, এবং চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে দর্শক নিজের অজান্তেই কাহিনীর সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্ম হয়ে যায় । এ ছাড়াও পরিবর্তনীয় গতির দৃশ্যের শটের বিশেষ একটা ধরন দেখা যায় । বেশীর ভাগ ে(ত্রেই দেখা যায় দৃশ্য শু(হয় লং শট দিয়ে । তারপর ত্র(মে ত্র(মে মিড লং, মিড, ক্লোজ এইভাবে ফ্রেমের আকৃতির মধ্যে একটা ধারাবাহিক সাযুজ্য রেখে দৃশ্যটা শেষ হয় । ফলে, চূড়ান্ত গতির, উৎকণ্ঠার সঙ্গে ফ্রেমের চরিত্রের একটা সংঘাত, সমন্বয়ও গড়ে ওঠে ।

বিপরীতমুখী গতির একটা সুন্দর শৈল্পিক প্রয়োগ আছে তপন সিংহের 'জতুগৃহ' ছবিতে, স্বামী-স্ত্রী ট্রেন থেকে পরস্পরের কাছে বিদায় নিচ্ছে দৃশ্যে । প্রথম শটে দেখি উত্তমকুমার ট্রেনের জানালার কাছে বাঁদিকে মুখ করে বসে আছে, ভাবছে । একটু পর উত্তমকুমার ট্রেনের জানালা খুললে দেখি বিপরীত দিকের ট্রেনের জানালায় অ(ন্ধতী দেবী ডানদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে । এক সময় দুজন দুজনকে দেখে, কথা হয় দুজনার মধ্যে । অনুতপ্ত দুজনেই । আবার নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখে,—না, সম্ভব না ! অ(ন্ধতী দেবীর ট্রেন ছেড়ে দেয় । প্রথমে 'আই-লেভেল' পরে 'টপ' শটে আমরা দেখি দুটো ট্রেন বিপরীত দিকে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে । বিপরীতমুখী গতির আর একটা সুন্দর ব্যবহার আছে তপন সিংহের 'অতিথি' ছবিতে। নদীতে নৌকো করে একদল গায়ক যাচ্ছে বাঁদিক থেকে ডানদিকে । আর অন্য পারে অতিথি ছেলেটা, পার্থ দৌড়ে দৌড়ে ডানদিক থেকে বাঁদিকে এসে এই দৃশ্য দেখছে অবাক বিস্ময়ে । এই দৃশ্যে ল(ণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, দৃশ্যটা শেষ হবার আগে ছেলেটার একটা নিরপে(শট ব্যবহার করা হয় । পরের শটে আমরা দেখি ছেলেটা বাঁদিক থেকে ফ্রেমে ঢুকে ব্যাক

টু ক্যামেরা, নৌকা করে গায়কের দল ডানদিকে চলে যাচ্ছে, দৃশ্যটা দেখছে । বিপরীতমুখী গতির আরও একটা সুন্দর ব্যবহার আছে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির যুদ্ধের দৃশ্যে । প্রথমে দেখি হাল্লা রাজার সৈন্যরা উটের পিঠে করে ফ্রেমের ডানদিক থেকে বাঁদিকে এগিয়ে যাচ্ছে । তারপর দেখি গুপী-বাঘা ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে দৌড়ে আসছে। ইন্টার-কাট করে দৃশ্যটা এগোতে থাকে । গুপী-বাঘা গান শু(করে । সৈন্যরা থেমে থাকে, দাঁড়িয়ে যায় । হল্লা রাজার ঘর, নেপথ্যে গুপী-বাঘার গান শোনা যায় । হঠাৎ যুদ্ধ(ত্রে আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নেমে আসে । সৈন্যরা আকাশের দিকে তাকিয়ে । রাজপ্রাসাদের বাইরে, রাজা ছুটে আসেন 'ছুটি-ছুটি-ছুটি' বলতে বলতে । আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়িগুলি মাটিতে পড়তেই সৈন্যরা হাঁড়ি ধরতে ছুটে যায় এবং হাঁড়ি ধরে মিষ্টি খেতে আরম্ভ করে । গুপী-বাঘা মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে রাজার দিকে ছুটে যায়। রাজা 'ছুটি-ছুটি' বলতে বলতে যুদ্ধের মাঠে ছুটে আসেন । হাল্লার মন্ত্রী একটা হাঁড়ি ধরে হামাগুড়ি দিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে । সৈন্যরা ছুটে যেতে গিয়ে মন্ত্রীর মিষ্টির হাঁড়িতে পা পড়ে ভেঙ্গে যায় । রাজা দৌড়াতে-দৌড়াতে এগিয়ে আসছেন । গুপী-বাঘা মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজাকে দেয় । রাজা মিষ্টি খেতে আরম্ভ করে । গুপী-বাঘা রাজাকে ডান এবং বাঁদিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে 'শুন্ডি' বলে তালি মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা অদৃশ্য হয় । এই দৃশ্যে আছে বিপরীতমুখী গতি এবং নিরপে(শটের অসাধারণ ব্যবহার । যেটা একমাত্র দেখে উপলব্ধি করা সম্ভব ।

নিরপে(গতির দৃশ্য ঃ

নিরপে(গতির দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তু ক্যামেরার কেন্দ্র, লেন্সের দিকে কিংবা বিপরীতত্র(মে ফ্রেমের কেন্দ্রের দিকে চলে যেতে থাকে । তাই নিরপে(শটের বাম বা ডান কোনও নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে না, এবং এই কারণে নিরপে(শট নির্দিষ্ট গতিশীল শট । অর্থাৎ একমুখী বা বিপরীতমুখী গতির শটমালার মধ্যে (ইন্টার কাট করে) জুড়ে দেওয়া যায় । মূলত অপরিবর্তনীয় গতি এবং পরিবর্তনীয় গতির দৃশ্যের মধ্যে নিরপে(গতির শট ব্যবহার করা হয় সমগ্র দৃশ্যটাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে এবং সময় বিশেষে, বিশেষ গতির ত্রুটিপূর্ণ দৃশ্যে, দৃশ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ।

একটা শট তখনই নিরপে(হবে (শটের আরম্ভ যেভাবেই হোক না কেন) যদি অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তু লেন্সের দিকে এগিয়ে আসে কিংবা বিপরীতত্র(মে ফ্রেমের কেন্দ্রের দিকে চলে যায়, ডান বা বাম কোনও দিক দিয়ে বেরিয়ে না গিয়ে । আবার কোনও শট নিরপে(ভাবে আরম্ভ করে বিশেষ একটা গতির শটে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, শট শেষ হওয়ার সময় অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তুকে ফ্রেমের ডান বা বাম যে কোন একটা দিক দিয়ে বের করে দিয়ে। একটা শট তত(ণই নিরপে(থাকে যত(ণ তাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তু ফ্রেমের কেন্দ্র থেকে সরে না যায়।

অনেক সময় দেখা যায় কোন দৃশ্য শু(হচ্ছে 'হেড-অন' শট দিয়ে । অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তু ক্যামেরার লেন্সের দিকে এগিয়ে আসছে । এবং কোন দৃশ্য শেষ হচ্ছে 'টেল এ্যাওয়ে' শট দিয়ে । অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চলমান বস্তু ফ্রেমের কেন্দ্র দিয়ে ত্র(মে অসীম দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে । সাহিত্যের একটা পর্ব বা পরিচ্ছেদ শু(এবং শেষ হবার মত । আবার, দৃশ্যে মধ্যবর্তী কোনও শটে দেখা যায় ক্যামেরা 'ট্যাকিং' বা 'জুম চার্জ' করে চরিত্র বা বিশেষ বস্তুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বা পিছিয়ে আসছে । কিংবা কোনও দৃশ্যে চরিত্র বা বিশেষ বস্তুকে উপর থেকে 'হাই-অ্যাঙ্গেল' বা নীচ থেকে 'লো-অ্যাঙ্গেল' দেখা যায় । অর্থাৎ চরিত্র বা বিশেষ বস্তু ক্যামেরার নীচ কিংবা উপর দিয়ে চলে যায় ।

যেহেতু নিরপে(শট দৃশ্যকে বৈচিত্র্যময় এবং বিশেষ অর্থবহ করে, তাই একটা ছবিতে প্রচুর নিরপে(শটের ব্যবহার ল(ণীয় । চলচ্চিত্রে আকৃতিগত অর্থাৎ আঙ্গিক অথবা মানসিক অর্থবহ অন্তর্নিহিত একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থাকে । বলা বাহুল্য যে, এই ব্যঞ্জনা বা রস উপলব্ধি করতে না পারলে কোনও শিল্পই উপলব্ধি করা যায় না । একটা দৃশ্য কীভাবে শু(হবে, কীভাবে বিস্তার লাভ করবে, কীভাবে ত্র(মে পরিণতি হবে, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরিচালকের প্রকাশভঙ্গির উপর। পরিচালকের শৈলীই সৃষ্টি করে শটের আভিধানিক অর্থ অতিত্র(ম করে অভিনব বিশেষ ব্যঞ্জনা বা রস । তাই বিশেষ কোন ছবির পরিচালকের পরিপ্রে(ত অনুসরণ না করে নিরপে(শটের কতকগুলো সাধারণ ব্যবহার উল্লেখ করা হল ।

চলচ্চিত্র নির্মাণের (ে ত্রে বিষয়টা যদি হয় Story telling বা Mith making, তাহলে শটের এই ধারাবাহিকতা অবশ্যই অনস্বীকার্য । প(ান্তরে এ ভাবনাও গু(ত্বপূর্ণ, where continuity break, the art entire । এই পরিপ্রে(তে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিটি মুহূর্ত অবশ্যই পরী(া-নিরী(ার সৃষ্টিকর্ম।

।। ক্যামেরা অ(।।

চলচ্চিত্রায়ণে চিত্রগ্রহণের (ে ত্রে ফ্রেমের চরিত্রের অবস্থান, আকৃতি এবং দৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার সময় বিশেষ ভাবে ল(্য করলে বোঝা যাবে চলচ্চিত্র গণিত, জ্যামিতি এবং মনস্তত্ত্বের সমন্বয়ে নিজস্ব সুর, তাল, লয়ে ছন্দোবদ্ধ। এবং চলচ্চিত্রের আদিতে অবস্থান করছে শট । শট বিভাজন । তাই দৃশ্য গ্রহণের সময় কতগুলি সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতেই হয় । তা না হলে চলচ্চিত্র আর নিজস্ব সুর, তাল, লয়ে বাজে না । ছন্দোবদ্ধ হয় না । সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, চলচ্চিত্রায়ণে যেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শটের পরিপ্রে(িতে বজায় থাকে—

১। ফ্রেমে চরিত্রের অবস্থানের প্রামাণ্যতা বা স্বাভাবিকতা ।

২। ফ্রেমে চরিত্রের আকৃতির সামঞ্জস্য ।

৩। ফ্রেমে চরিত্রের দৃষ্টির, ত্রি(য়াকলাপের, পোশাকের, আলোর ধারাবাহিকতা ।

মনে করা যাক, কোন দৃশ্য একটা 'লং ইকোয়াল প্রেফারেনস' শট দিয়ে শু(হয়েছে । ফ্রেমের বামে 'ক' এবং ডানে 'খ' পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, কথা বলছে । এখন 'ক' এবং 'খ'-কে একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত(করলে যে রেখাটা সৃষ্টি হবে সেটাকে বলে 'ক্যামেরা অ(' রেখা । এবং ল(ণীয়, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকে 'ক' এবং 'খ'-কে ঘিরে স্বয়ংত্রি(য়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে কাল্পনিক এক ১৮০° ডিগ্রী অর্ধবৃত্ত । চলচ্চিত্রে দৃশ্য গ্রহণের (ে ত্রে এই 'ক্যামেরা অ(' ১৮০° ডিগ্রী এবং অর্ধবৃত্তের গু(ত্ব বেদবাক্যের মত । এই (ে ত্রে দ্বিতীয় শট গ্রহণের সময় উপরোক্ত(তিনটে শর্ত বজায় রাখতে হলে আমরা কখনোই 'ক্যামেরা অ(' এবং অর্ধবৃত্তের সীমা অতিত্র(ম করতে পারবো না । অর্থাৎ উল্টো দিকে যাবো না । যদি 'ক্যামেরা অ(' অতিত্র(ম করি, তবে ফ্রেমের চরিত্রের অবস্থানের এবং দৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না । 'ক' ক্যামেরা ডানদিকে এবং 'খ' ক্যামেরা বামদিকে চলে আসবে । তাই দৃশ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় শট আমাদের নিতে হবে হয় 'ক-খ'-এর 'এস-পি' কিংবা 'খ-ক'-এর 'এস-পি' । এখানে আরও যা উল্লেখযোগ্য, তা হলো প্রতিটি শটের, ফ্রেমের আলোকবিন্যাস এবং বর্ণত্র(মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবং সুটিং-এর সুবিধা ও সময় সং(েপের জন্য 'ক-খ'-এর ডান কিংবা বাম, যে কোনও একদিকের সব শটগুলি আগে নিয়ে অন্যদিকের শটগুলি পরে নেওয়া হয় । অর্থাৎ যে কোন একদিকের কাজ প্রথমে শেষ করে আর একদিকের কাজ শু(করা । তাহলে, আবার মনে করা যাক, এই (ে ত্রে ক্যামেরার ডান দিকের শটগুলি আমরা আগে নেবো । অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় শট নিচ্ছি 'ক-খ'-এর 'মিড এস-পি' বা 'ওভার দ্য সোলডার শট' । তাহলে, দ্বিতীয় শটে আমরা পাচ্ছি ফ্রেমের বাঁদিকে 'ক' এবং ডানদিকে 'খ'-এর কিছু অংশ । এবং 'ক' ক্যামেরার ডান দিকে 'খ'-এর দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ নিজের বাম দিকে তাকিয়ে 'খ'-এর সঙ্গে কথা বলছে । এখানে ল(ণীয় বিষয় এই যে, প্রথম শটের পরিপ্রে(িতে দ্বিতীয় শটে আমাদের উপরোক্ত(তিনটে শর্তই বজায় থাকলো । এইবার আমরা তাহলে তৃতীয় শট নিচ্ছি (দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) 'ক'-এর ক্লোজশট । 'ক' ক্যামেরার ডানদিকে তাকিয়ে 'খ'-এর সঙ্গে কথা বলছে । কাজের শর্ত অনুযায়ী এবার আমরা ক্যামেরার বাঁদিকের শটগুলি নেবো । অর্থাৎ বামদিকের প্রথম (চতুর্থ) শট নিচ্ছি । 'খ-ক'-এর 'মিড এস পি' বা 'ওভার দ্য সোলডার' শট ।

ফ্রেমের ডানদিকে 'খ' এবং বামদিকে 'ক'-এর কিছু অংশ । 'খ' ক্যামেরার বামদিকে অর্থাৎ নিজের ডানদিকে তাকিয়ে

‘ক’-এর সঙ্গে কথা বলছে । ল(ণীয়, এই ((ত্রেও আমাদের উপরোক্ত(তিনটে শর্ত বজায় থাকল । এবার বাম দিকের দ্বিতীয় (পঞ্চম) শট নিচ্ছি ‘খ’-এর ক্লোজশট । ‘খ’ ক্যামেরার বামদিকে তাকিয়ে ‘ক’-এর সঙ্গে কথা বলছে । এখানে আর যা উল্লেখযোগ্য, যদিও সুটিং-এর সুবিধার জন্য উপরোক্ত(ভাবে দৃশ্যটা গ্রহণ করা হল, অর্থাৎ প্রথমে ডানদিকের ১-২-৩ এবং তারপর বামদিকের ৪ - ৫ শট । কিন্তু পর্দায় দৃশ্যটা আমরা দেখবো চিত্রনাট্যের বিন্যাস, চলচ্চিত্র সম্পাদনা, পরিচালকের প্রকাশভঙ্গি অনুসারে হয়তো বা—

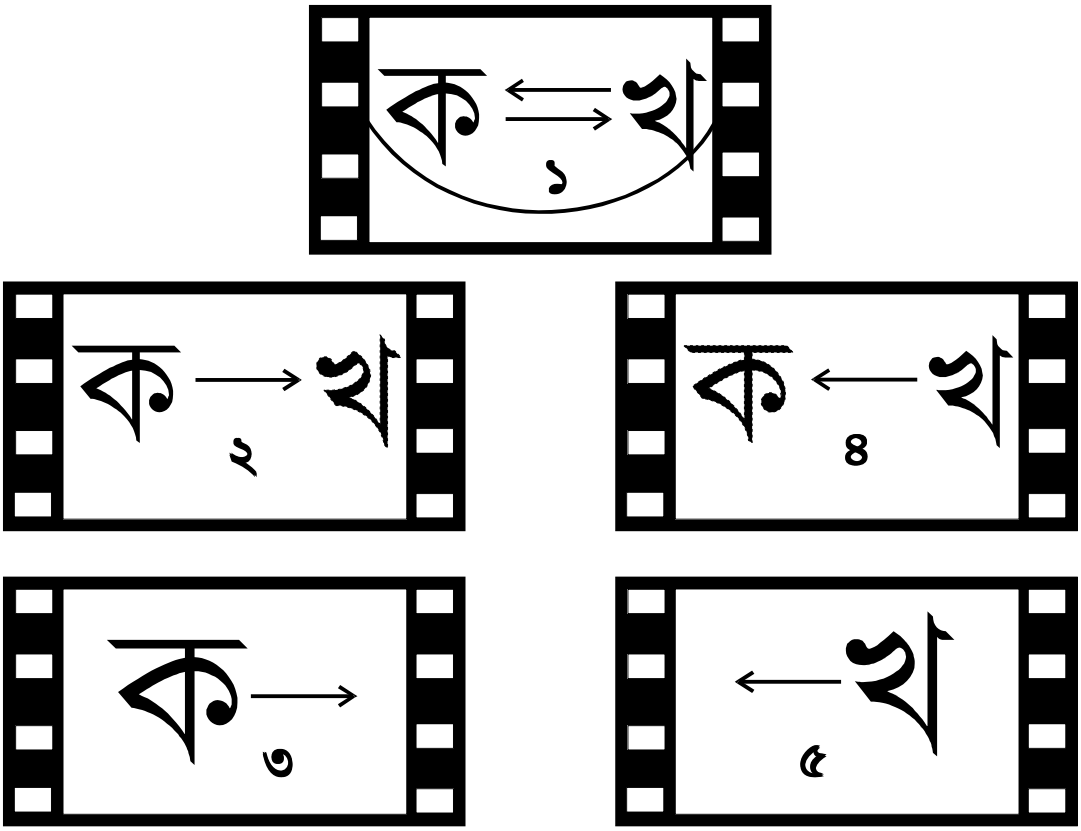

সম্পাদনার রীতি অনুযায়ী ঃ

১ নং শট ‘ক-খ’-এর লং ইকুয়াল প্রেফারেন্স বা ই/পি শট
২ নং শট ‘ক-খ’-এর মিড এস / পি বা ওভার দ্য সোলডার শট
৩ নং শট ‘খ-ক’-এর মিড এস / পি বা ওভার দ্য সোলডার শট
৪ নং শট ‘ক’-এর ক্লোজশট
৫ নং শট ‘খ’-এর ক্লোজশট

সুটিং অনুযায়ী ঃ

১
২
৪
৩
৫

অথবা

সম্পাদনার রীতি অনুযায়ী ঃ

১ নং ‘ক-খ’-এর ইকুয়াল প্রেফারেন্স (ই/পি) শট

সুটিং অনুযায়ী ঃ

১

২ নং 'খ-ক'-এর মিড এস / পি বা ওভার দ্য সোলডার শট ৪
৩ নং 'ক-খ'-এর মিড এস / পি বা ওভার দ্য সোলডার শট ২
৪ নং 'খ'-এর ক্লোজশট ৫
৫ নং 'ক'-এর ক্লোজশট ৩

উভয়(ত্রেই আমরা আবার ১ নং শট অর্থাৎ, 'ক-খ'-এর লং 'ই-পি' শটে ফিরে আসতে পারি প্রয়োজনে ।

আবার এমনও হতে পারে, প্রথম 'কখ'-এর ইকুয়াল প্রেফারেন্স দিয়ে দৃশ্য শু(করে তারপর 'ক' এবং 'খ' কিংবা 'খ' এবং 'ক'-এর ক্লোজশট দিয়ে তারপর 'কখ-'খক'-'খক' কিংবা 'কখ' মিড এস.পি শট দিয়ে আবার 'কখ'-এর ই.পি শট-এ ফিরে আসতে পারি । এছাড়াও আরও কয়েক রকম ভাবে এই দৃশ্যটা সাজানো যেতে পারে পরিচালনা এবং সম্পাদনা অনুযায়ী ।

যে কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে পৃথিবী সমদ্বিখণ্ডিত, অর্থাৎ বিষুব রেখা বা নির(রেখা-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, তাহলে 'ক্যামেরা অ(' ১৮০° অর্ধবৃত্তের গোপন রহস্য বোঝা যাবে । যে দিক থেকে কোন দৃশ্য প্রথম শু(হয়েছে সেটা সোজা দিক এবং স্বভাবতই সোজা দিকের বিপরীতে অবস্থান করছে উল্টো দিক বা বিপরীত দিক ।

উল্লেখযোগ্য, আমরা যদি ক্যামেরা অ(, ১৮০° অর্ধবৃত্তের সীমা অতিত্র(ম করে বিপরীত দিক থেকে শট নিই, তবে ফ্রেমের চরিত্রের অবস্থানের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ চরিত্রের ডান-বাঁয়ের অবস্থান এবং চরিত্রের দৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না । কিন্তু এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত । এই ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটবে ।

নিয়ম যেমন আছে আবার নিয়মের ব্যতিত্র(মও আছে । অনেক দৃশ্যে পরিচালক বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে বিপরীত ক্যামেরা-অ(শট, শটমালার মধ্যে ব্যবহার করে থাকেন, মূলত পরিচালকের শৈলী, নাটকের অভিঘাত, ফ্রেমের চরিত্রের পরিপ্রে(তের পরিবর্তন এবং দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্য । ল(ণীয় যে, বিভিন্ন রকম ট্রলি শটে 'ক্যামেরা অ(' তো সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে দৃশ্যের গতিশীলতার অপরিহার্য নিয়মে । যে পরিচালকের সিনেমা গ্রাফিক্সের উপর দখল যত বেশী, তিনি নানা ভাবে নিয়মের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তত অভিনব আঙ্গিকে চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করে আমাদের সামনে হাজির করেন।

যেমন 'গুপীগাইন বাঘাবাইন' ছবিতে, দৃশ্যটা শু(হয়েছে— ভোর । গুপী-বাঘা বাঁশবনে অঘোরে ঘুমাচ্ছে । একটু পর গুপীর ঘুম ভাঙে । মনে পড়ে যায় গত রাতের ভূতের বরের কথা । ভাবে স্বপ্ন ! হঠাৎ পাশের থলিতে হাত ঢুকিয়ে দেখে ভূতের রাজার দেওয়া জুতো । থলেটা নিয়ে সামনের দিকে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আপন মনে বলে—

ভূতের রাজা দিল বর, / জবর জবর তিন বর !

গুপী নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়, সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে তান ধরে—আ-আ-আ—

চমৎকার গলা, নিজের গলার সুরে নিজে মুগ্ধ হয়ে হাত তালি দিয়ে আনন্দে একটা ডিগবাজি খেয়ে গান শু(করে—

দ্যাখরে নয়ন মেলে / জগতের বাহার, / জগতের বাহার—

গুপীর গানে বাঘার ঘুম ভেঙে যায় । গুপীর গান শেষ হলে সে ঢোল বাজাতে বাজাতে গুপীর কাছে ছুটে আসে, এবার দুজনে গান শু(করে—ভূতের রাজা দিল বর / জবর জবর তিন বর ...

গান শেষ হলে ওরা হাত তালি দিয়ে ভূতের বরে খাবার এনে নদীর পাশে খেতে বসে । খাওয়া শেষ হলে ওরা নদীর জলে হাত ধুয়ে নেয় । এর পর মাঠে বসে ভূতের বর নিয়ে আলোচনা শু(করে ।

বাঘা মাঠের মধ্যে বসে, গুপী ব্যাক টু ক্যামেরা বাঘার সামনে দাঁড়িয়ে ।

বাঘা ঃ চাইবো কি ? তিনের বেশি বর তো ছিলই না । আমি তখনই বুঝেছি, তিন বর যথেষ্ট নয় ।

এমন সময় দূর থেকে নেপথ্যে ওস্তাদি গানের শব্দ ভেসে আসে । গুপী বাঘার দৃষ্টি ডান দিকে ঘুরে যায় ।

আমরা দেখি দূর থেকে ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে গায়কের দল আসছে । তারপর দেখি ফ্রেমের ডানদিক দিয়ে ঢুকে পালকি চেপে ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে বাঁ-দিকে চলেছেন তার সঙ্গে বাজিয়ে-দল এবং অন্যান্যরা মিছিল করে চলেছে। এই

শটেই ক্যামেরা ডানদিক থেকে বাঁদিকে ট্রাক করলে দেখি মিছিল গুপী-বাঘার সামনে দিয়ে চলে যায় । অর্থাৎ গুপী-বাঘা ফোরগ্রাউণ্ডে ব্যাক-টু-ক্যামেরা দাঁড়িয়ে আছে । এবার দেখি গুপী-বাঘার ক্লোজ-কমপোজিট শট । বাঁদিকে তাকিয়ে ।

বাঘা ঃ কোথায় যাচ্ছে গো ? কি ব্যাপার বল দেখি ?

তার পরের শটে দেখি ওস্তাদের দল ফ্রেমের বাঁদিক দিয়ে ঢুকে ডানদিকে যাচ্ছে । গুপী-বাঘা তাদের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে প্র্ন করছে —

বাঘা ঃ ও দাদা ! ও খুড়ো ! ও চাচা ! কোথায় যাচ্ছ গো ?

ক্যামেরা জুম চার্জ করে শুধু গুপী-বাঘা এবং জনৈক-কে ফ্রেমে ধরে ।

জনৈক ঃ শুণ্ডি ।

বাঘা ঃ সেখানে কি হবে গো ?

জনৈক ঃ গানের বাজি হবে ।

বাঘা ঃ কেন বাজি হবে ? বাজি কেন ?

জনৈক ঃ রাজামশাইয়ের গান শোনার শখ হয়েছে । যাকে পছন্দ হবে তাকে রেখে দেবে ।

এবার দেখছি গানের মিছিল ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে । তারপর দেখি গুপী-বাঘা অবাক হয়ে ফ্রেমের ডানদিকে তাকিয়ে আছে ।

এই দৃশ্যে প্রথমে আমরা দেখি ওস্তাদের দল ডানদিক থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে । পরে আমরা দেখি বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে । অর্থাৎ ক্যামেরা-অ(পরিবর্তন হয়েছে একই ধারাবাহিক দৃশ্যে । এটা কী করে হলো ? এখানে যেটা বিশেষভাবে ল(ণীয়, সেটা হলো, দ্বিতীয়বার যখন আমরা গানের মিছিলের দৃশ্য দেখি, তখন পরিচালক বিশেষ দ(তার সঙ্গে দৃশ্যটা বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য গুপী-বাঘাকে ফ্রেমের ফোরগ্রাউণ্ডে রেখে তাদের পরিপ্রে(ত পরিবর্তন করেছেন এবং সেই অনুসারে 'ক্যামেরা অ('ও পরিবর্তন করা হয়েছে ।

পথের পাঁচালী ছবিতে অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্যে কাশবনের মধ্যে বসে হঠাৎ দুর্গা অপুর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে কান পেতে কি যেন শোনে । তারপর ফিস ফিস করে বলে 'রেলগাড়ি' । ফ্রেমে ফোরগ্রাউণ্ডে দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছে । তখন ফ্রেমের ডানদিক দিয়ে দূরে রেলগাড়ি আসছে সাদা মেঘের মধ্যে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে । অপু-দুর্গা সেদিকে দৌড়ায় । দুর্গা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় । অপু লাইনের কাছে যায় । এবার আমরা দেখি অপুর সামনে দিয়ে ট্রেন ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে । ট্রেন চলে যায় । অপু সেদিকে তাকিয়ে থাকে । ট্রেনের ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া কাশবনের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'চরাচর' ছবিতে চলচ্চিত্র আঙ্গিকের অভিনব প্রয়োগে চলচ্চিত্রের ভাষার নিজস্ব দিগন্ত প্রসারিত করে আমাদের অবাক করে দিয়েছেন । যদিও দৃশ্যটা না দেখলে বর্ণনা শুনে এর গু(ত্ব, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ঠিক যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা যাবে না, তথাপি দৃশ্যটা বর্ণনা করছি ।

শট - ১) লং শটে আমরা দেখি জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় ভূষণ আর লখা কাঁধে বাঁকে পাখির খালি খাঁচা নিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসে ক্যামেরার বাঁদিকে চলে যায় ।

লখা ঃ কাজটা কি ঠিক হলো ভূষণ কাকা ?

ভূষণ ঃ আমি কি যেচে কথা বইলেছি ? বাবুই তো বইললেন । আমরা শাসমলবাবুকে পাখি বেচবো না তা তো নয় । যা পাখি ধরবো তার কিছু দেবো কলকাতায়, কিছু বেচবো শাসমলবাবুকে । লইলে সন্দ করবে ।

লখা ঃ বুদ্ধিটা ভাল বের করেছো ।**—কাট।**

শট - ২) এবার আমরা দেখি ক্লোজশটে ভূষণ কথা বলতে বলতে ফ্রেমের ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে যায় ।

ভূষণ ঃ শাসমলবাবু আমাদের কি ঠকানটাই না ঠকায় ! একবার ভেবে দ্যাখ ! সস্তায় কিনে নিয়ে কালীচরণ বাবুরে একেকটা

পাখি ব্যাঁচে পনেরো-বিশ টাকায় । আমাদের থেকে যে দামে নেয় সে হুঁশ আছে !—**কাট।**

শট - ৩) এবার আমরা দেখি ক্লোজশটে লখা কথা বলতে বলতে ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যায় ।

লখা ঃ হা, হা, আমরা শিকার করি পাখি, আর শাসমলবাবু শিকার করে আমাদের । আমার হাত থেকে মাঝে মধ্যে পাখি যেমন পালায়, আমরাও তেমন পালাচ্ছি শাসমলবাবুর হাত থেকে ।
হে, শালা, আমারে বাটপারি শেখাচ্ছে গো । হে, হে ।—**কাট ।**

শট - ৪) এবার আবার শট নং (২)-এর মত ক্লোজশট । ভূষণ ফ্রেমে ডানদিক থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে ।

ভূষণ ঃ তোর যত আজগুবি কথা ! বেশি দর পেলে সংসারের আয় কত বাড়বে বল দেখি । গৌরীটার বিয়ের বয়স হয়েছে । তার একটা গতি তো কইরতে হবে ? তোর বউটারও তো সাধ-আ(াদ আছে ? দু বেলা পেটভরি ভাত । দু-একটা গয়নাপত্তর পেলি সে তোর বশে থাকবে ।—**কাট ।**

শট নং - ৫) এবার আবার শট নং (৩)-এর মত ক্লোজশট । লখা ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে ।

লখা ঃ সবই ঠিক গো কাকা । তা শ্যাষ পর্যন্ত সেই পাখি আমারে বেইচতেই হবে ।—**কাট ।**

এবার দেখি লখা আর ভূষণ ব্যাক-টু-ক্যামেরা কথা বলতে বলতে লং শটে জঙ্গলের মধ্যে ফেড আউট হয়ে যায়।

ভূষণ ঃ না হলে তোর মুখ দেইখে কে আর পয়সা দিচ্ছে ?

দৃশ্যটা এইভাবেই শেষ হয় ।

এই দৃশ্যে যা উল্লেখযোগ্য, তা হলো—এখানে একমুখী গতি, বিপরীতমুখী গতি, নিরপে(গতি, ১৮০° ক্যামেরা অ(যে নিয়মগুলি আমরা উল্লেখ করেছি তার কোনটাই মানা হয়নি । কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এই যে, ছবির মূল ভাবে এবং এই খণ্ডাংশের নাট্যসংঘাতে যে সাংগীতিক কাঠামো দৃশ্যায়ত করা হয়েছে, তা যেমন অভিনব, তেমনই বিস্ময়কর—সাহিত্য নিরপে(একান্তই চলচ্চিত্রের ভাষা । আসলে গতি একমুখী বা বিপরীতমুখী যা-ই হোক, ক্যামেরা অ(অপরিবর্তিত থাকুক বা না থাকুক, ফ্রেমের চরিত্রের, বস্তুর, আকৃতির, অবস্থানের, দৃষ্টির, পোশাকের, ত্রি(য়াকলাপের, আলোর, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ বলার এবং শব্দের ধারাবাহিকতাই চলচ্চিত্র নির্মাণের গু(ত্বপূর্ণ ব্যাকরণ ।

এখানে আরও যেটা উল্লেখযোগ্য, অবাক হওয়ার বিষয়, সত্যজিৎ রায়ের 'অপু—ট্রিলজি'তে একটা ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয় । 'অপরাজিত' ছবিতে অপুরা ট্রেনে করে যখন বেনারস থেকে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করে তখনই নেপথ্যে 'পথের পাঁচালী'র ভাবনা (থিম) সঙ্গীত বেজে ওঠে । চলচ্চিত্রের ভাষা, চলচ্চিত্রের সংগীতে ব্যবহারের পরিপ্রে(তে এই দৃশ্যের আলোচনার গু(ত্ব চলচ্চিত্র-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় । কিন্তু এখানে অদৃশ্যে আরও একটা ঘটনা যে ঘটে গেছে, সেটা এযাবৎ কেউ ল(্য করেছেন কিনা জানি না । দুটো ছবিকে 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'-কে একসুরে বাঁধতে যেমন একই ভাবনা সংগীতের ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনই গতির ধারাবাহিকতার ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য । ল(ণীয়, পথের পাঁচালীর শেষ দৃশ্যে হরিহর গ(র গাড়ী করে ফ্রেমের বাঁদিকে ঢুকে ডানদিকে গ্রাম ছেড়ে কাশী যাচ্ছে । আবার, 'অপরাজিত' ছবিতে আমরা দেখি অপুরা কাশী ছেড়ে গ্রামবাংলার মনসাপোঁতায় ফিরে আসছে ট্রেনে করে । ট্রেন ফ্রেমের ডানদিকে ঢুকে বাঁদিকে চলে যায় । চলচ্চিত্রে এই ধারাবাহিকতা নিছক নির্মাণের ব্যাকরণে আর আবদ্ধ থাকে না । আভিধানিক অর্থ অতিত্র(ম করে সৃষ্টি করে বিশেষ শিল্পচেতনা যা চলচ্চিত্র দর্শনের নন্দনতত্ত্বে অতিরিক্ত(মাত্রা—অভিনব ব্যঞ্জনা, স্ট্রাকচারাল বি(্বদৃষ্টি ।